

একতারা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত

প্রকাশক
চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং
১৫ নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য ৷৹ আট আনা

১৩৩৩

২৪ নং মিডিল্ রোড, ইটালি, কলিকাতা, ইণ্ডিয়া প্রেস হইতে
শ্রীক্ষেত্রনাথ বসু দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা

—০—

একতারার কতকগুলি কবিতা সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। সামান্য গ্রাম্য ঘটনা,—বিষয় ক্ষুদ্র, কবি ও ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র একতারাতে বড় সুর বাজিবে না, বাজাইবার সামর্থ্যও নাই।

———

গ্রন্থকার

উৎসর্গ।

মামাবাবু,—

তব গৃহ-তপোবনের স্নেহ-শ্যামল কুটীর ছায়,
কাটায়েছি শৈশব যে 'ধনো' 'কচির' সঙ্গে হায়।
বিমল স্নেহ নির্ঝরেতে তাদের সঙ্গে করে স্নান,
লভিয়াছি কতই শিক্ষা কতই দীক্ষা কতই দান।
রাণু তার সে সবল প্রীতি নিত্য মনে পড়ছে আজ
স্নিগ্ধ বনজোৎস্নাটী ছিল তপোবনের মাঝ।
কোরক পারিজাতের সম হেরি 'কচি' 'রাণুর' মুখ
লভিয়াছি কতই শান্তি কতই তৃপ্তি কতই সুখ।
দিয়াছ যে অনেক মোরে, দেবার কিছু নাইক মোর,
জীবন ধরে থাকুক ঘিরে তব স্নেহ-ঋণের ডোর।
অনাসক্ত সংসারেতে, যশে তব স্পৃহা নাই;
উদাসীনের একতারাটী কমলকরে দিলাম তাই।

স্নেহবৰ্দ্ধিত

কুমুদরঞ্জন।



ডাক্তার অমৃত লাল সরকার এল্, এম্, এস।

সূচী।



একতারা।

ইন্দ্রজাল।

বুঝিতে নারি' তোমার লীলা পারিনে হরি বুঝিতে
কি খেলা তুমি খেলিছ তব ভুবনে,
কোরকে ফুল ঝরায়ে ফেল দাওনা তারে ফুটিতে,
বধ সে পাখী, রত যে মধু কুজনে।
সতী সিঁথার সিঁদূর টুটে, হাতের লোহা ভাঙ্গিয়া,
মুচকি তুমি হাস হে বসি বিরলে,
সারসী প্রাণে ভীষণতম সায়ক খানি হানিয়া,
বুঝাও তার শাবকটীরে কি বলে!
দেখিয়া তব দারুণ লীলা হয়েছে মনে ধারণা
চল চপল গোপবালক বট হে,
করুণাময় করুণা তব, থির রাখিতে পার না,
অতি নিপট কপট তুমি শঠ হে।



পাখিমারা।

—০—

কেন গাছ তলে ফিরিছ নিষাদ
সাঁজে লয়ে ধনু বাণ,
সারাদিন ধরি' বধেছ ত কত
নিরীহ পাখির প্রাণ।
মৌন প্রদোষে শান্ত কুলায়
শ্রান্ত বিহগী ফিরিতেছে হায়,
উপবাসী তার শাবক কটী'রে
আহার করিতে দান,
তুমি সেথা কেন ফিরিছ নিষাদ
হাতে লয়ে খর বাণ।

(২)

ওই শুন নভে ডেকে ডেকে আসে
শ্রান্ত বলাকা দলে,
শুভ্র যূথীর মালিকা দোলায়ে
শ্যাম যামিনীর গলে।



কতগুলি হৃদি উহাদের তরে
আশাপথ চেয়ে আছে দিন ধরে,
তাদের মিলন পুলক মাঝারে
রোদন দিওনা তুলে,
ওই শুন নভে ডেকে ডেকে আসে
শ্রান্ত বলাকা দলে ;

(৩)

ওই শুন কাঁদে বিধুরা চকোরী
চকোর মিলন লাগি',
পিকবধূ ওই গুমরি কাঁদিছে
পিক আগমন মাগি' ।
বিহগ বিহগী সুখ সন্ধ্যায়
মিলিছে তাদের ক্ষুদ্র কুলায়,
শান্তির মাঝে আনি' অশান্তি
হয়োনা হে পাপভাগী ;
ওই শুন কাঁদে বিধুরা চকোরী
চকোর মিলন লাগি ।



(৪)

প্রকৃতির শ্যাম শান্তি ভবনে

পূত মন্দির মাঝে,

বেদীর উপর হত্যাকাণ্ড

দেখি প্রাণে বড় বাজে।

আরতির কালে ক্রন্দন ধ্বনি

আনিবে কেনহে বধি ক'টী প্রাণী,

তাদের এ সুখে হওয়া প্রতিবাদী

বল কি মানুষে সাজে ?

বেদীর উপর হত্যাকাণ্ড

দেখি প্রাণে বড় বাজে।

(৫)

তোমারও ত ভাই আছে পরিবার

পুত্র, কন্যা, প্রিয়া ;

কতই শান্তি, কত দয়া, মায়া,

লভ তুমি সেথা গিয়া।

ভাব, সেই স্নেহ দুর্গের দ্বারে

যদি হে তোমারে প্রাণে কেহ মারে,



কি দারুণ ব্যথা পাবে প্রিয়জন
ভাব আপনারে দিয়া,
তোমারও ত ভাই আছে পরিবার
পুত্র, কন্যা প্রিয়া।

শরাহত কপোত।

নদীতীরে একা ভ্রমিতেছিলাম একদা ফাগুন প্রাতে,
দেখিনু সমুখে পতিত কপোত নিষাদের শরাঘাতে।
কাতরতা মাখা রাঙ্গা আঁখি দুটী, ম্লান চাহনীটী তার,
যাতনামথিত, ধূলিলুণ্ঠিত, সে কোমল দেহভার।
দিনু গায়ে হাত, বারেক পক্ষী চাহিল নয়ন তুলি,
পিয়ে মরণের কূট হলাহল পলকে পড়িল ঢুলি'
তার সে চাহনা যে কথাটী হায় কয়ে গেল মোর প্রাণে,
অর্থ তাহার পাইনে খুঁজিয়ে বিশ্বের অভিধানে।



পতিহারা।

—০—

বিনায়ে কাঁদিছে সতী পতি বিহনে
সে ছিল যে সুধাসম চিরজীবনে।
বদন ভাসিছে জলে, ভাসিছে আঁখি,
সেজেছে যোগিনী ধূলি ভসম মাখি,
নয়ন হেরিতে নারে সে শোক ছবি,
ভাষায় ফুটাতে তাহা পারে না কবি।
গুমরি কাঁদিছ একা, ও পাগলিনী!
ধরার নয়নজল আনিছ টানি।

———



উৎকণ্ঠিতা।

—০—

বছর তিন কাটিয়া গেছে আজিকে শুভদিন,
কুলীনস্বামী আসিবে গৃহে আজ,
পথের মাঝে রেখেছে পাতি' সলাজ দিঠি ক্ষীণ,
আজিকে বালা ভেটিবে হৃদিরাজ।
শূন্যহিয়া সিনানে গিয়া কলসী চলে ভাসি'
কোথায় আঁখি কোথায় তার হিয়া,
সখীর দলে কত কি বলে ঢলিয়া পড়ে হাসি
সরমে বালা কলসী ধরে গিয়া,
যেমতি সতী ব্যাকুলা অতি হেরিতে প্রাণ নাথে
ব্যাকুল তাঁর নয়ন মন দেহ,
হয়না আধ ব্যাকুল তার হেরিতে জগনাথে
'পুরীর' পথে রথেরো দিনে কেহ।



লজ্জিতা ।

প্রথম প্রেমলিপি পেয়েছে নববধূ
সুখের নাহি সীমা আজিরে.
পড়িতে নাহি জানে তবু ও খনে খনে
হৃদয় ভরি উঠে দেখিরে ।
প্রতি আঁখর মাঝে পীযূষ ধারা রাজে
পীয়িতে চাহে মন চকোরী,
বুঝিতে নারে মানে লিখিতে নাহি জানে
মুদিত ফুল কাঁদে ভ্রমরী ।
নিশিথে দীপ আনি হেরে সে লিপি খানি
দেখাতে চাহে না সে কাহারে,
নাথের দেখা পেলে আদরে দেবে তুলে
তাহারি দেওয়া নিধি তাহারে ।

কৃষ্ণা রজনী।

—০—

বুঝি সে দিন সজনি এমনি রজনী
আঁধিয়ার,
এমনি প্রখর ঝটিকা মুখর
চারিধার।
সতী সাবিত্রী মৃত পতি কোলে
একাকিনী ভাসে নয়নের জলে,
শিয়রে শমন কত কথা বলে
দমকে দামিনী বারেবার।
বুঝি সে দিনো সজনি এমনি রজনী
আঁধিয়ার।

(২)

বুঝি সে দিনো এমনি গুরুগর্জ্জন
অবিরল,
মত্ত পবনে বরুণ রাজ্য
টলমল।



গাঙ্গুরের নীরে ভাসাইয়া ভেলা,
মৃতপতি দেহ আবরি' বেহুলা
চলে অসহায়া একাকিনী বালা
ঝরে নিশিদিন আঁখিজল,
বুঝি সে দিনো এমনি গুরু গর্জ্জন
অবিরল।

(৩)

বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলি
খনেখন
আঁধার নিশার আঁধার বাড়ায়ে
অনুখন।
বারানসী ধামে গঙ্গার তীরে,
ধূলি লুন্ঠিতা শৈব্যার ক্রোড়ে
চণ্ডালবেশী নৃপতি নেহারে
মৃত পুত্রের সে বদন,
বুঝি সে দিনো এমনি ঝলসে বিজলি
খনে খন।



(৪)

বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর
কলকল,
বন মর্ম্মরে ভীত চকিত
মৃগদল।
দময়ন্তীরে ফেলি বনমাঝ
কোথা পলাইয়া গেল নলরাজ,
কাঁদে রাজবধূ অনাথিনী আজ
মলিন বদন শতদল ;
বুঝি সে দিনো এমনি জলের কাতর
কলকল।

(৫)

তব সনে মিশি আছে নিশি কত
হাহাকার,
কত শ্মশানের অঙ্গার কত
আঁখিধার।



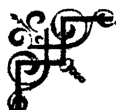
শোকের কালিমা যুগ যুগ ধরি'
তোমার আঁধার দিয়াছে যে গড়ি'
কত সুষমার কত চিতা মরি
নিভেছে জ্বলেছে অনিবার।
তব সনে মিশি আছে নিশি কত
হাহাকার।

———



বৃদ্ধ কামার।

বৃদ্ধ কামার একটী তনয় তার
পাহাড়ের গায়ে স্বচ্ছ নির্ঝর ধার,
নাহি আত্মীয় বান্ধব পরিবার,
সেই টুকু শুধু স্নেহের কোমল হার।
বড় হ'ল ছেলে, নববধূ এলো ঘরে,
ভাঙা মালঞ্চে অশোক ফুটিল যে রে,
উদাসীন আহা পুন হল গৃহবাসী,
শুষ্ক বদনে আবার ভাতিল হাসি।
যৌবন প্রান্তে সে তনয় গেল মরি
প্রতিপদ চাঁদ ডুবিল আঁধার করি।
লীলাময় তব একি অপূর্ব্ব লীলা,
প্রাণ লয়ে তব একি দুরন্ত খেলা।



প্রত্যাবর্ত্তন।

কুলীযুবা ফির্‌ছে ঘরে যুগের পরে আজ
কত সুখ দুখের চিত্র জাগছে হিয়া মাঝ।
পুঁটুলীটী দেখছে খুলে মায়ের তরে তার,
কলের কাপড় যাচ্ছে লয়ে, শীতের কাঁথা আর।
বেলোয়ারি কাচের চুড়ি প্রণয়িনীর তরে,
অতি ছোট আর্শী খানি যত্নে কাগজ মুড়ে'
কভু আবার তুলে লয়ে সখের বাঁশী খান
গাহে যুবা মনের সাধে নূতন শেখা গান।
যে বিচিত্র চিত্রে তাহার হৃদয় খানি আলা
কোথায় লাগে তাহার কাছে রোমের চিত্রশালা।



দীনের দান।

—০—

ব্রাহ্মণ কাতর অতি হয়েছে দারুণ পীড়া
সঞ্চয় নাহিক কিছু ঘরে
তনয় ব্যাকুল হয়ে সাহেব ডাক্তার আনে
ভিজিট কেমনে দেবে তারে।
লয়ে থালা ঘটী বাটী চলেছে বেচিতে আহা
ডাক্তার ইঙ্গিতে বোঝে সব,
চাহিনা ভিজিট আমি বলি ফিরালেন ঘোড়া
দুটী প্রাণ চকিত নীরব,
পিতা রোগ শয্যাপরে পুত্র পিতা পদতলে
ডাক্তারের মাগিল কল্যাণ,
ফিরিয়োনা রিক্ত হস্তে হে ভিষক লয়ে যাও
হৃদয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান।



উপবাসী।

উপবাসী আজ কন্যার সাথে দুখিনী
ঘরে নাই চাল, অন্ন ও আজ জোটেনি।
কাটেনা দিবস, কাতর প্রহর গণিয়া,
মহান্ত ভাত পাঠাইয়া দেন শুনিয়া।
অনাহারী হায় যেতেছে আহারে বসিতে
বহু দিন পরে তনয় আসিল দেশেতে।
কন্যা জননী অনাহার দুখ ভুলিয়া,
মহা আনন্দে হারানিধি নিল তুলিয়া।
তাহারে খাওয়ায়ে কত সুখী হল দুজনা
ভুলে গেল ক্ষুধা শত দুখ ক্লেশ বেদনা।
তারা তিন জনে বসে হাসিভরা বদনে,
অশ্রু জোয়ার আসিল আমার নয়নে।



শেয়ালমারা।

—০—

এসেছিল আমাদের এই গাঁয়ে
কোথা হতে শেয়ালমারার দল,
চটের তাম্বু পেতে' ডাইনে বাঁয়ে
সকাল থেকে করতো কোলাহল।

তা'রা আসার পরে কয়েক দফাই
নিকট গ্রামে লাগলো হতে চুরি :
তা'দের কর্ত্তৃক হচ্ছে বল্‌লে সবাই,
ভিক্ষা ছলে তারাই বেড়ায় ঘুরি'।

গাঁয়ের লোককে জ্বালিয়ে তুলেছিল
তারা তাদের ভীষণ কলরবে,
চৌকীদারকে হুকুম দেওয়া হল
কালকে প্রাতে তাড়িয়ে দিতে হবে।



শুনলে না ক চৌকীদারের কথা
হল না কো উঠতে তারা রাজি,
দিতে লাগলো লোকে লাঠীর গুঁতা
তবু অটল, এমনি তারা পাজি।

সবাই মিলে মারলে তাদের ধরে
ছিঁড়ে দিলে চটের তাম্বু গুলি,
নিলে তাদের 'হলকা' কুকুর কেড়ে'
মেয়ে গুলা পাড়তে লাগলো গালি।

ছেঁড়া তাঁবু গাধার পিঠে তুলে,
চাপিয়ে দিয়ে যাবৎ ছেঁড়া কাঁথা ;
তারা সবাই যেতে লাগলো চলে
একটী তাঁবু রইলো শুধু পাতা।

দেখলে ঢুকে গাঁয়ের সবে গিয়ে
একটা যুবা শয্যাশায়ী জ্বরে,
কাছে বসে একটী ছোট মেয়ে
আপনি কাঁদে, সান্ত্বনা দেয় তারে।



উঠলো সে যে গ্রামবাসীরে দেখি,
চাইলো এমন কাতর মলিন মুখে,
রইল না কো শুষ্ক কোনই আঁখি
দুখী হল সবাই তাহার দুখে।

ছুটে গিয়ে শেয়ালমারাদেরে
বল্‌লে সবাই আয় গো ফিরে হেতা,
নূতন তাঁবু দেবই চাঁদা করে
তারা কিন্তু শুনলে না কো কথা।

তিন দিনের দিন মুদলে আঁখি পিতা
মেয়েটী হায় কাঁদতে লাগলো ডাকি,
তাহার কান্না, তাহার করুণ কথা,
মানুষ কেন, কাঁদায় পশু পাখী।

অনেক চেষ্টা করলে সবাই মিলে
মেয়েটী তার রইলো না গো হেতা,
আজও গ্রামে শেয়ালমারা এলে
সুধাই মোরা সেই মেয়েটীর কথা।



স্নেহময়ী।

দারুণ পীড়ায় অতি বিশীর্ণ দেহ,
গৃহের বাহিরে তনয় বসিয়া আছে—
পার্শ্বে জননী হৃদয়ে অপার স্নেহ
বীজন করেন বসিয়া একাকী কাছে।
নিশা জাগরণে কালিমা-ক্লিষ্ট-তনু
শত আতঙ্কে ভরা প্রাণ টুকু তাঁর,
তনয়ের লাগি দেহ প্রাণ অণু অণু
দান করিছেন যেন মাতা অনিবার।
ছিন্ন পক্ষ শাবকে বক্ষে ঢাকি'
সারসী যেমন যতনে আগুলি রাখে,
তেমনি জননী সদা জাগ্রত আঁখি
সারা প্রাণ দিয়া ঘেরিয়া আছেন তাকে।

বিক্রীত।

ক্রেতা আসি ওই বাঁধি' লয়ে যায় গাই,
ছাড়িতে তাহারে কাঁদে ছোট দুটী ভাই,
ধেনু যায়, আর চায় তাহাদের পানে
কে যেন তাহারে বারবার পিছে টানে।
কাতর সে ক'টী আঁখির ভাষাটী মরি,
বুঝাতে পারিনে, আঁখি জলে উঠে ভরি।



পালিত।

বহুদিবস বলদটীরে প্রিয় বলদটীরে
অর্থাভাবে ফেলেছে বেচি চাষা.
ভুলিতে তারে পারেনি আজো ভুলিবে বল কিসে,
ভোলা যে বড় কঠিন ভালবাসা।
চলেছে পথে অচেনা গাড়ী সে আছে পথ পাশে
অচেনা গরু চাটিল হাত খানি,
চকিতে চাষা চিনিল তারে যেমন হল দেখা,
দেখাল তার তনয়ে ডাকি' আনি।
নড়ে না গরু বুলায় শিঙ. লাঙ্গুল নাড়ে ধীরে,
সজল দুটী অচল আঁখি তারা ;
এই যে ছবি করুণ ছবি উঠিছে ফুটি ধীরে.
পড়ে' কি কবি তুলিতে তব ধরা ?



কৃতজ্ঞতা ।

একদা পৌষের প্রাতে দুখে জীর্ণ শীর্ণ কায়
চলেছে পথিক এক, শীতে ঠেকে পায় পায় ।
হেরিয়া কম্পিত পদ, হেরি ম্লান মুখখান,
চোখেতে আসিল জল কাঁদিয়া উঠিল প্রাণ ।
ছেঁড়া বালাপোশ খানি দিনু ডাকি হাতে তার,
গায়েতে জড়ালো সেটী, বহে দর দর ধার ।
'যে শান্তি দিল এ দীনে' বলে জুড়ি দুটী কর
'যুগে যুগে সুখ শান্তি দিয়ো তারে হে ঈশ্বর ।
যে করিল অভাগার এত শীত নিবারণ,
তার দুখ ব্যথা যেন ঘুচাইয়ো নারায়ণ ।'
কে বলে কৃতঘ্ন নরে ; নহে তাহা সত্যকথা ;
হায় কত তুচ্ছ দানে কি গভীর কৃতজ্ঞতা !



হত্যাকারী।

বৃদ্ধ ধনীরে পাইয়া দস্যু দলে
ছুরিকা তাহার বসাইয়া দিল গলে।
অস্ফুট তার অনুচ্চারিত ব্যথা,
বেদনাব্যথিত প্রাণের কাতর কথা,
কেহ দেখিল না, কেহ শুনিল না ভবে,
গোপনে পুলকে বলাবলি করে সবে।
জেনোরে দস্যু, তাঁহার বিশাল আঁখি
সকলি দেখেছে, কিছুই পড়েনি ফাঁকি।
তাঁহার শ্রবণ সকলি শুনেছে, মূঢ়,
রাজার রাজার শাসন নীতি যে গূঢ়।
দিবসে নিশীথে জানিবি রে পাপমতি
বিশ্বনাথের দণ্ড কঠোর অতি।



কুলীর মৃত্যু।

পাহাড়ের পাশে পাশে চা গাছের সারি
শূন্য ঘর সেই শুধু একা পড়ে আছে,
আপনার কাজ লয়ে ব্যস্ত সবে ভারি
স্নেহ দয়া দেখাইতে কে আসিবে কাছে।
দুষ্ট 'আড়কাটি', লোভে ভুলাইলা, তারে
আনিয়াছে হেতা, তার স্থিতি ছ বছর,
আরো ছ বছর পরে ফিরে যেত ঘরে,
মৃত্যু আসি অসময়ে দিল অবসর।
আজ শ্রান্ত আঁখি কোণে ভাসে বারবার
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর বাঁকে,
আশাপথ চায় যেথা প্রিয়া বারবার
পাণিয়া ভরণে যায় কলসীটী কাঁকে।
প্রাণ তার কেঁদে উঠে ছুটে যেতে চায়
বর্ষার বলাকা সম সেই সুখ নীড়ে;
আঁধারি আসিছে ধরা তবু চক্ষে ভায়
তার সেই ছোট ঘর গোমতীর তীরে।



ডাকার মত ডাক।

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে গোবর কুড়ায়ে ভ্রমে
বৃদ্ধগোপ শায়িত শয্যায়,
অবসর নাহি তিল খাটে দোঁহে নিশিদিন
দরিদ্রের বিশ্রাম কোথায়।
গোবরের ঝুড়ি মাথে ফিরে যবে গ্রাম্যপথে
দেবালয়ে নিনাদে কাঁশর,
তিলেক নামায়ে ঝুড়ি বলে দোঁহে করজোড়ি
ডাকিতে দিলে না অবসর।
প্রণমি চিন্তিত মনে ফিরে যায় গৃহপানে
যখন মন্দিরে বাজে শাঁক,
ভেবনা দুখিনী তুমি শুনিবেন অন্তর্যামী
প্রথমেই তোমাদের ডাক।



নীড়ভ্রষ্ট ।

মন পাখী মোর বীতরাগ ওগো
আর নব নীড় রচনে.
খর শরাহত মোর এ কপোত
প্রবোধ মানেনা বচনে ।
আশা তরু পরে যত রচে নীড়
উড়াইয়া দেয় উতল সমীর,
একিরে কপাল ভাঙ্গি পড়ে ডাল
নতুবা শুকায় তপনে,
মন পাখী মোর বীতরাগ ওগো
আর নব নীড় রচনে ।

(২)

পাষাণে বাঁধিয়া ভাঙ্গা বুক তার
বল কত বাসা রচিবে ?
সিক্ত পাখায় লুকাইয়া মুখ
কত আর পাখী কাঁদিবে ।



সব দিয়ে হায় ভালবাসে যারে
সে সবারি আগে ফাঁকি দেয় তারে,
যাহারে করিবে নয়নের আলো
সেই সে নয়ন ধাঁধিবে।
পাষাণে বাঁধিয়া ভাঙা বুক তার
বল কত বাসা বাঁধিবে।

(৩)

শোক শায়কের নিদারুণ ব্যথা
বল পাসরে সে কেমনে,
গত প্রাণাধিকপ্রিয়মুখ স্মৃতি
সদা যে জাগিছে নয়নে।
প্রাণ বিনিময়ে দাও দেখি ঢাকি',
চির বিদায়ের ছল ছল আঁখি,
দারুণ দিনের নিদারুণ স্মৃতি
মুছেও মুছে না মরণে।
শোক শায়কের নিদারুণ ব্যথা
বল পাসরে সে কেমনে।



(৪)

মন পাখী তাই কাঁদিয়া ফিরিছে
অকুল অতল আকাশে.
শত হা হুতাশ নয়নের জল
মিশিছে অধার বাতাসে।
সীমাহীন নভ, সীমাহীন দুখ ;
হবে তাহে হারা তার ছোটবুক,
সে যাবে মিলায়ে নভ নিলামায়
প্রেম রাকাশশী সকাশে।
মন পাখী তাই কাঁদিয়া ফিরিছে
অকুল অতল আকাশে।



বাহকের গান।

—০—

ধরামাঝে তার কাজ হল আজ অবসান,
সব ছেড়ে তব ক্রোড়ে জুড়াতে ছুটেছে প্রাণ।
বহু জল ঝড় সয়ে,
সে যে আনিয়াছে বেয়ে
তব প্রেমসিন্ধু কূলে, ভাঙ্গা তার তরী খান;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।

(২)

সংসারের অনলেতে জ্বলেছে যে দেহখান,
অনলে তাহাই আজ হয়ে যাবে অবসান।
শান্তি বারি দাও ঢেলে
তুলে নাও তব কোলে,
অনলে বিশুদ্ধকর৷ তার আত্মা মন প্রাণ
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।



(৩)

ভস্ম তার সুরধনী জাহ্নবীতে লীয়মাণ,
ফুরাইল তার কথা, তার মান অভিমান।
নাহি আর কোন কাজ,
তার মন ভৃঙ্গ আজ
চরণপঙ্কজ তব ঘেরি গাহে নবগান;
দীনবন্ধু কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু কর দান।



সহমৃতা।

মন্ত্র পড়ি' দিয়াছে বাঁধি অটুট গাঁটছালা,
সঁপিয়াছি যে চরণে হৃদিখানি,
যাঁহার বুকে হরষ মুখে সহেছি শত জ্বালা,
যাঁহার লাগি দুখেরে সুখ মানি।
যুগে যুগে যে দেবতা মোরে বাসিয়াছেন ভাল,
শত জনম যাঁহার ছিনু আমি,
অঞ্জন যে নয়নে সখি, হৃদয়ে যিনি আলো,
পুণ্যবলে পেয়েছি যাঁরে স্বামী,
কঠিন তপ তপিয়া যাঁরে পেয়েছি চির সাথী
জীবনে তাঁর মরণে হব তাঁরি,
অমর ফুলশয্যা আজি অনল দেছে পাতি'
চিতায় কেন হবে বা ছাড়াছাড়ি।

নৌকাপথে।

—০—

মাঝি—ভিড়ায়োনা চলুক তরী
নদীর মাঝে,

তরী—এঘাটেতে বাঁধব না কো
আজকে সাঁজে।

ওই ঘাটে ওই বকুল গাছে,
জলটী যেথা ছুঁয়েই আছে,

এখনো ওই যে ঘাটেতে
পল্লী বালার কাঁকণ মাঝে।
তরী সেথা বাঁধব না কো আজকে সাঁজে

(২)

ডুবছে রবি নীল গগণে,
যদিই আঁধার হয়ে এসে,
তবু নদীর মাঝে মাঝে
তরী মোদের চলুক ভেসে।



এই গাঁয়ের ভাই নামটী শুনে,
প্রাণটী এমন করে কেনে,
ঘুমপাড়ানো কোন বেদনা
জেগে উঠে হৃদয় মাঝে ;
তরী হেতা বাঁধব না কো আজকে সাঁজে।

(২)

মৌন সাঁজের ম্লান মাধুরী
কতই ব্যথা আনছে ডেকে,
গ্রামের সাঁজের দীপটী ছোট,
বিষাদ ছবি দিচ্ছে এঁকে।
একটী গৃহ হোতায় কি না
ছিল আমার বড়ই চেনা,
ছবিটী যার আজ ও আমার
হৃদয় কোণে সদাই রাজে
তরী হেতা বাঁধবনা কো আজকে সাঁজে।

(৪)

এই নদীরই এই ঘাটেতে
এমনি সাঁজে আমার প্রিয়া,
যেত ছোট কলসী খানি
কোমল তাহার কক্ষে নিয়া।
সোহাগে জল উথলে উঠি
বক্ষে তাহার পড়ত লুটি,
পথের মাঝে আমায় দেখে
ঘোমটা দিত হর্ষে লাজে,
তরী হেতা বাঁধব নাকো আজকে সাঁজে

(৫)

ওই ঘাটে ওই গাছের পাশে
তটিনীর ওই শ্যামল কুলে,
দিয়েছি সেই স্বর্ণলতায়
আপন হাতে চিতায় তুলে।
আজকে ও সেই চিতার পরে
শিথিল বকুল পড়ছে ঝরে
আজও মধুর মুখখানি তার
দেয় যে বাধা সকল কাজে
তরী হেতা বাঁধবো নাকো আজকে সাঁজে।



বিধবা।

—:—

শশুর ভবনেতে কত দিবস পরে,
দুখিনী পতিহারা এসেছে আজিকেরে।
মলিন দীনবেশ হিমের কমলিনী,
একের অভাবেতে বিধূরা অনাথিনী।
সেই সে তরুলতা, সাজান্ ঘর বাড়ী,
তাদের যত শোভা গিয়াছে সব ছাড়ি'।
সাঁজে প্রদীপ লয়ে শয়ন গৃহ দ্বারে,
হৃদয় কাঁপে, কাঁপে চরণ বারে বারে।
শয়ন হেরি আসে নয়নে ঘন বারি,
হৃদয়ে ফুটে উঠে সে মধু মুখ তারি।
স্বরগে সব আশা, ভরসা, সুখ তার,
ধরায় শুধু ত্যাগ, ক্ষমা, পরোপকার।
বলরে বিধি কোন পাষানে বাঁধি হিয়া,
আনিলি কমলারে যোগিনী সাজাইয়া।

—



পুত্রহারা।

—ঃ—

শেয়ালেতে নিয়ে গেছে কচি ছাগল ছানাটীরে,
মাতাটী তার কাতর ব্যাকুল ডেকে ডেকে ঘুরে ফিরে।
হৃদয়ভেদী কি কাতর ডাক, কি দারুণ সে চঞ্চলতা ;
হতাশ আকুল চাহনীতে ব্যক্ত শত মর্ম্মব্যথা।
ছুটে বেড়ায় উঠানেতে, ছুটে যায় সে গোহাল মাঝে ;
হায় গভীর কি ভীষণ ব্যথা আজকে তাহার বক্ষে বাজে !!
পুত্র শোকে এত কাতর হয় যদিগো পশু পাখী
মানবী মাতার যাতনা সাধ্য কার যে ফুটায় আঁকি'।

———

পিতৃমুখ।

—০—

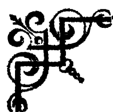
পান্থ একা চলেছে পথে আঁধার আসে ঘনায়ে
দস্যু আসি দাঁড়াল তার সুমুখে,
পরাণ ভয়ে পান্থ তার চরণ ধরে জড়ায়ে
করুণা কোথা দিবে করুণা বিমুখে।
উঠালো জোরে লগুড় ভীম বধিতে ধনী পথিকে
বদন পানে চাহি থামিল থমকি,
মৃত পিতার বদন সম পান্থ মুখ নিরখে
দস্যু হিয়া তাও উঠিল চমকি।
পথিকে পথ ছাড়িয়া দিল; পাষাণ মাঝে হরি হে
রেখেছ তুমি মন্দাকিনী লুকায়ে,
পাষাণ চেয়ে পাষাণহৃদে বল কেমন করি হে
যায়নি আজও পূত ধারাটী শুকায়ে।

———



ছেলেধরা।

অজয়ের খুব ধারে
কেশে বেড়া এক ঘরে
ফিরে সে সন্ধ্যা হলে,
ছেলে মেয়ে গুটি চার
যায় সাথে সাথে তার
গ্রামে ভিক্ষায় গেলে।
দেহ অতি কদাকার
বড় ঝুলিখানা তার
দাড়ি পড়িয়াছে বুকে,
দূরে তার দেখা পেলে
লুকায় বালক দলে
ছেলেধরা বলে লোকে।
দেখি তার ছেলে গুলি
সবে করে বলাবলি
এনেছে তাদিকে ধরে.



অত সুন্দর ছেলে
নতুবা কোথায় পেলে
অত কর্কশ ক্রোড়ে।
হায় একদিন রাতে
অজয়েতে পার হতে
ডুবিল তরণী খান,
দুটী ছেলে গেল ভেসে
ছেলেধরা বহু ক্লেশে
বাঁচাল দুটীর প্রাণ।
ছেলে দুটী তারে তুলে
পুন সে ঝাঁপালো জলে
সে দুটীর সন্ধানে,
কই উঠিল না আর
সব জলে একাকার
কোথা গেল কেবা জানে।



কিন্তু সকলে বলে
রজনী গভীর হলে
ছেলেধরা আসে ফিরে।
নদীতে ছেলে না পেয়ে
আকাশের পানে চেয়ে
মন্ত্র হাঁকে সে তীরে।
কঠিন হুকুমে তার
ডাকে বায়ু বারবার
আছাড়ে নদীর জল।
গভীর আঁধার জল।
নদী সারারাত ধরে
ডাকে কল কল স্বরে
বলে কোথা গেলি বল
কোথা গেলি তোরা বল !

———



আর কতক্ষণ।

—০—

পড়িয়াছে চোখে মৃত্যু কালিমা অধর হয়েছে কালী
সারা দেহে তার এক কুলা বিষ কে যেন দিয়াছে ঢালি,
হতাশ হইয়া ডাক্তর গেছে রোগী ও বুঝেছে সব.
শুষ্ক নয়ন জলে ডব ডব, মুখে নাহি কোন রব।
'আর কতখন' এই শেষ কথা রোদন উঠিল ঘরে,
নিভিল প্রদীপ কয়টী পরাণ আঁধার আঁধার করে।
কাল পারে নাই ঘুচাতে সে স্মৃতি সে অতি দারুণ ব্যথা
শয়নে স্বপনে সদা বিঁধে প্রাণে তার সেই শেষ কথা।

———



প্রজাপতির মৃত্যু।

—০—

প্রজাপতি এক মধু বৈশাখী প্রাতে
করবী কুঞ্জে একটী করবী পাতে
মণি সন্নিভ দুইটী ডিম্ব রাখি,
বারেক ফিরাল মৃত্যুআঁধার আঁখি।
শেষ বিদায়ের করুণ চাহনী মরি!
সুত মঙ্গল কামনায় দিল ভরি।
স্নেহ ভাণ্ডারে সঞ্চিত শত নিধি,
নিঃশেষ করি ঢালি দিল যেন হৃদি।
সময় আসিল কাঁপিল করবী শাখা,
মৃত প্রজাপতি টলিয়া পড়িল পাখা।

———



বাৎসল্য ।

—০—

বিদ্রোহী সিপাহী দল দয়ামায়াহীনপ্রাণ
বাছেনা বালক বৃদ্ধ কেটে করে খান খান ।
হেরি এক শ্বেত শিশু সিপাহী জনেক হায়
কুসুম কোমল দেহ সঙ্গিনে বিঁধিতে চায় ।
শিশুরে উপরে ছুড়ি', পাতিল সঙিন তার,
হি হি করে হাসে শিশু ভাবে এ আদর কার ।
বক্ষে ধরি শিশুটীরে সঙিন নামায়ে রেখে
ফিরিল সিপাহী তার ক্ষুদ্র গৃহ অভিমুখে ।



স্নেহের জয়।

—০—

ভীম সংগ্রামে যুঝি বিক্রমে
রাজপুত গেল হারি',
প্রবেশিল আসি যবন সৈন্য
হিন্দুর বাড়ী বাড়ী।
জহরব্রতের পুণ্য অনল
দহিল অযুত স্বর্ণ কমল,
ব্রহ্মার কোলে পশিল পুলকে
সতী সীতা সারি সারি।

(২)

বিজয়ী সৈন্য দেখিল মুক্ত
বিশাল ভবনে ঢুকে,
একটী রমণী পিয়াইছে দুধ
তনয়ে ধরিয়া বুকে।



প্রাণেশ বালার সমরের মাঝ
বীরের শয়নে ঘুমায়েছে আজ,
জল নাই চোখে বেদনা দারুণ
ফুটিয়া উঠেছে মুখে।

(৩)

অরাতি শিশুরে সৈন্য জনেক
জোরে নিতে চায় কেড়ে,
ঝাপটী ধরিল বক্ষে জননী
আপন তনয়টীরে।
এত কি কঠিন বাহু সুকোমল
ছাড়াতে নারিল সৈন্য সবল,
গর্ব্বিত সেনা অসির আঘাত
করিল জননী শিরে।

(৪)

রুধিরেব ধারা ঢাকিয়া ফেলিল
বালকের সারা দেহ,



দূর হতে তাহা দেখিয়া সেনানী
প্রবেশিলা আসি গৃহ।
বলিলেন ডাকি 'ওরে নরাধম
মানুষের হৃদি এত নির্ম্মম,
পাস্‌নি পামর কখন কি তুই
নিজ জননীর স্নেহ।'

(৫)

সভয়ে সরিয়া দাঁড়ান সৈন্য
নত করি আঁখি যোড়,
সেনাপতি ব'লে ও বাহু ছাড়াতে
সাধ্য কি আছে তোর।
স্নেহের অযুত কঠিন বাঁধন
অসিতে কি কাটা যায় রে কখন
ও যে ভরতপুরের চেয়ে দুর্জ্জয়
জননীর স্নেহ ক্রোড়।



(৬)

জননী কণ্ঠে জড়াইল শিশু
　　দুটী বাহু সুকোমল,
দেখি সেনানীর বিশাল নয়ন
　　হয়ে এলো ছল ছল।
বলিলেন "বীর ক্ষম অপরাধ
ছেড়ে চলিলাম তোমার প্রাসাদ্
স্নেহের দূর্গ ভাঙিতে নাহিক
　　আমাদের বুকে বল।"

অমর বিদায়।

—০—

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
পোহাইলে সুখরাতি
যে হবে অযোধ্যাপতি,
যোগীর বল্কল বাসে
তারে কি সাজায়
অভিষেকে নির্ব্বাসন
বোধনেতে বিসর্জ্জন,
পূর্ণিমায় অমানিশি
দেখে কে কোথায় ?
শ্রীরাম যায় গো বনে
সীতা লক্ষ্মণের সনে,
জগত সজল আঁখি
থমকি দাঁড়ায়.



যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(২)

অমর বিদায় ওরে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
ক্রূর অক্রূরের সাথে
হরি গেল মথুরাতে,
শ্যামসোহাগিনী রাধা
ধূলায় লুটায়,
গাহেনাক শুক সারী,
অধীর যমুনা বারি,
শ্যামলী ধবলী আজি
তৃণ নাহি খায়
কাঁদে গোপবালা গণে
চাহি তমালের পানে,



ভাসানো কলসী কোথা
ফিরিয়া না চায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৩)

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
বুদ্ধদেব গৃহ ত্যজি
লভিতে চলেন আজি,
জন্ম মৃত্যু বাৰ্দ্ধক্যের
প্রশম উপায়,
মায়ার বাঁধন টুটি'
বিশ্ব পানে যান ছুটি
অহিংসা পরম ধর্ম্ম
বুঝাতে সবায়।



কাঁদে রাজা শুদ্ধোধন,
কাঁদে গোপা অনুক্ষণ,
কাঁদিছে কপিলবস্তু
পাষাণ হিয়ায়।
যুগ যুগ ধ'রি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৪)

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা
অময় বিদায়,
আঁধিয়ারি নদীয়ারে
কাঁদাইয়া শচী মারে,
নিমাই সন্ন্যাস লন
আজি কাটোয়ায়।
কেঁদে মরে ক্ষৌরকার
হাত নহি উঠে তার



কেমনে সাজাবে দণ্ডী
নবীন যুবায়,
ভকতের আঁখিজলে
কঠিন পাষাণ গলে
ডুবু ডুবু শান্তিপুর
নদে' ভেসে যায়।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখি-জল
ললিত গাথায়।

(৫)

অমর বিদায় ওযে অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
'কোরেসের' অত্যাচারে
ওই চলি যান দূরে
ইরম্মদ মহম্মদ
ত্রিদিব প্রভায়,



ওরে সে যে সর্ব্বত্যাগী
ডরে না প্রাণের লাগি,
পবিত্র ইসলাম-ধর্ম্ম
জানাবে সবায়।
দিতে এসেছিল ধরা,
তখন বুঝেনি ধরা,
এখন কাঁদিছে বসি
পূত মদিনায়।
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি,
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।

(৬)

অমর বিদায় ওযে, অমর বিদায় আহা,
অমর বিদায়,
ওই ক্রুশে আরোপিয়া
মারিছে যন্ত্রণা দিয়া



চিরক্ষমাশীল যীশু
নর দেবতায়.
কণ্টক মুকুট শিরে
দিয়া কি করিবি ওরে,
ত্রিদিব কিরীট যার
শিরে শোভা পায়.
যীশু হায় ক্রুসে থেকে
জগৎ পিতারে ডেকে
বলেন ক্ষমিও পিতা
অবোধ সবায়,
যুগ যুগ ধরি কবি
আঁকে সে করুণ ছবি
বেঁধে রাখে আঁখিজল
ললিত গাথায়।



তীর্থফল।

মানসে সাধ আছিল বড় হেরিতে হিমাচলে
ছিল গো সাধ সারা জীবন ধরি,
হেরিব আমি গোমুখী—যেথা পড়িছে ধরাতলে
কলুষহরা পীযূষধারা ঝরি'।

যেতেছি পথে থামিনু আসি একদা নদী তীরে
হেরিনু এক সাধক বসি আছে.
চরণ তলে জাহ্নবীটী যেতেছে বহি ধীরে
অন্য কেহ নাহিক আর কাছে।

পদ্মাসনে বসিয়া সাধু মগ্ন মহাধ্যানে
নয়ন দিয়ে মন্দাকিনী পারা,
বক্ষবহি পড়িছে ঝরি ছুটিছে তাঁরি পানে
পরমানন্দময়ী পাবনী ধারা।

প্রণমি তাঁরে ফিরিল ঘরে তৃপ্ত হিয়া কবি
গোমুখী আর হলনা তারে যেতে,
ফিরিল ঘরে হৃদয় ভরে সে মহা ফল লভি
আধেক যার গোমুখী নারে দিতে।



বলিদান।

মাগো আমার গা মুছিয়ে দিয়ে
পরিয়ে দাও শীগ্‌ঘির কাপড় খান,
আজকে আমি ভুলুর সাথে গিয়ে
দেখে আসবো কেমন বলিদান।
দেখে 'বলি' কেমন আমোদ হবে
নাচবে সবাই বল্‌লে ভুলু মোরে
মা, মা, বলে ডাকবে তখন সবে
বাজবে বাজনা খাজজিঝঝো করে।
চুপে যখন ফিরলো খোকা বাড়ী
মুখটী মলিন চোক দুটী ছলছল,
জননী তার সুধান তাড়াতাড়ি,
কেমন 'বলি' দেখলি বাছা বল ?
কেঁদে খোঁকা বললে কই মা বলি
শুধু আহা কাটছে ছাগলগুলি !



গুরুদণ্ড ।

পড়িতে পারে তবু পড়ে না একবার,
দূরেতে বই ফেলে পলায় বারবার,
নিষেধ মানেনা সে, দুষ্ট অতিশয়
গুরু কি গুরুজন করেনা কারে ভয় ।
শুনিয়া রোষভরে আনানু বেতখান
ধরিনু হাতদুটা মুখটী হল ম্লান ।
কাজলজলেভেজা চাহিল আঁখি তুলি
সকল দোষ তার নিমেষে গেনু ভুলি ।
ছাত্র শিশুটীরে লইয়া কোলে তুলে,
বলিনু ভাল করে পড়িস বোকা ছেলে ।



মহোৎসব।

বড়ই পুলক সেদিন উজানি মেলা,
বালক কয়টী করিতে ছিলাম খেলা,
খেলনা খাবার কেণে' সবে মনোসুখে
দাঁড়ায়ে ছিলাম আমি শুধু নত মুখে।
মেলার প্রচুর আমোদ প্রমোদ মাঝে,
কি অভাব যেন উঠেছিল হৃদে বেজে.
মাসিমা চারিটী পয়সা দিলেন ডাকি.
সুখের আমার রহিলনা কিছু বাকি।
যে সুখী হইনু চারিটী পয়সা তুলে,
হইনে তা আজ হীরকের খণি পেলে।



প্রবাসে।

সুদূর প্রবাসে দেখি হৃদয় মুকুর মাঝ,
গ্রামের অধিক তার ছায়া যে সুন্দর আজ।
কখন ত আসি নাই গ্রাম্য তটিনীর পারে
জানি নাই এতদিন কত ভালবাসি তারে।
সেই নদী সেই মাঠ সেই সুখ নীড় খানি
বরষের আঁখিজল নিমেষে নিতেছে টানি।
যাহা ছিল দীন তুচ্ছ, ছিল অতি সাধারণ
আজি তা অপূর্ব্ব রাগে মোহিতেছে দুনয়ন।
হেথা শুষ্ক কোলাহল শুনিতেছি একাযাই
চৌদিকে লোকের ভিড় শুধু চেনা লোক নাই।
চাহি ওই চাঁদ পানে পাই তবু কিছু সুখ
যেন এ অচেনা দেশে একখানা চেনা মুখ।



বাদল সর্দ্দার।

বাদল সর্দ্দার অসীম বল যার
এখন হীনবল শকতি নাহি আর।
গ্রামেতে আসে কত যুবক পালোয়ান,
নাচে যে 'রায়বেশে' ঘুরায় লাঠীখান।
সে একা বসি দূরে বাহবা দিয়া হায়
আপন নিপুণতা পুন দেখাতে চায়।
ঘুরাতে নারে লাঠী, বসিয়া পরে দুখে
দেখিয়া উঠে হাসি যত অচেনা লোকে।
হেরি সে ম্লানমুখ নয়ন ছল ছল
আমার আঁখি দুটী ভরিয়া আসে জল।
মনেতে জেগে উঠে পুরাণ স্মৃতি সব
তাহার বাহুবল, সে গত গৌরব।



পরিব্রাজক।

পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এক বীর অবধূত নামে,
কিছুদিন ধরি ছিল আসি হায় আমাদের এই গ্রামে।
বন্ধন হীন, সুখে উদাসীন, ব্যথা নাই কোন দুখে
নয়ন তাহার ক্ষমাসুন্দর, হরিনাম সদা মুখে।
অশোক তাহার আনন্দ ধারা নিয়ত যাইত বয়ে
গ্রামবাসিগণ ধন্য হইত কণাটুকু তার পেয়ে।
মাসেকের পর সন্ন্যাসীবর চলি গেল দূর দেশে,
পথহারা কোন দেবতার মত পড়েছিল যেন এসে।
আজো বার বার স্মৃতিটুকু তার হৃদয়ে উঠিছে ভাসি'
বন্ধনহীন বেঁধে গেল হৃদি কোন ছলে হেতা আসি।
ক্ষণেকের তরে মোহিয়া সবারে ওগো কাননের পাখি,
বেদনা জড়িত স্মৃতিটী তোমার গেলে চিরতরে রাখি।



ক্ষমা প্রার্থনা।

আঁধার নিশায় না পারি চিনিতে অন্নদাতারে তার
চেনা কুক্কুর করে চীৎকার পথ মাঝে অনিবার।
বিদ্যুৎ আলোকে কথার সাড়ায় চিনিতে পারিয়া তাঁরে,
অবোধ কুকুর জানায় মিনতি চরণে লুটায়ে পড়ে।
পশু কুক্কুর তাহারো হৃদয়ে গভীর কৃতজ্ঞতা,
গর্ব্বিত নর, লজ্জিত হও স্মরি নিজ নিজ কথা।



খঞ্জ।

—o—

অবিচার নাহি তোমার
শুনি আমি যেথা সেথা
অচল এ দীন জনে
জনম দাওনি বৃথা।
করেছ চরণ হীন
তাই এ ভরসা জাগে.
ভঙ্গুর এ পঙ্গু জন
তব চরণ পাবে আগে।



গফুর।

—০—

খিন্ন শ্যেন শাবক এক পড়িয়া পথ মাঝারে
অর্দ্ধ মৃত তৃষ্ণাতুর চঞ্চু দুটি প্রসারে।
তুচ্ছ করে চলেছে সবে, দেখেনা তারে নিরখি'
দীন কৃষক গফুর সেথা আসি দাঁড়াল থমকি।
গামছা খানি আদ্র করি সলিল ভরি আনিয়া
শ্যেন শাবক চঞ্চু পুটে ঢালিয়া দিল ছানিয়া।
সলিল পিয়ে চাহিয়া পাখী মুদিল দুটী আঁখিরে
নীরব শত আশীষ ধারা ঢালিয়া গেল গফুরে।

*　　*　　*

বহু বরষ কাটিয়া গেছে গফুর আজি বৃদ্ধ
এবার হজে মক্কা যাবে রবে না অবরুদ্ধ।
গুছায়ে তুলি দ্রব্যগুলি চলিল সব যাত্রী
সুখ আলাপে দিবস কাটে সুখ স্বপনে রাত্রি।
জাহাজ হতে নামিয়া সবে মক্কা করি লক্ষ্য
উষ্ট্রোপরি লাগিল যেতে ভক্তি ভরা বক্ষ।



দিনের পরে যামিনী ভোরে দৈব প্রতিদ্বন্দ্বী
বিসূচিকা যে গফুর দীনে করিল তার বন্দী।
মরু মাঝারে নামায়ে তারে চলিল সব পান্থ,
রোগের বিষে অবশ তনু দীর্ণপ্রাণ শ্রান্ত।
দারুণ তৃষা বক্ষ ফাটে কাঁদে গফুর ত্যক্ত
আল্লা আজি রক্ষা কর, মরে যে তব ভক্ত।
মূর্চ্ছাতুর লুটিছে রোগী, বালুকা মাখা অঙ্গে
কে যেন ধীরে ক্লিষ্ট শির তুলিল উৎসঙ্গে।
শিরেতে দিল আশীষবাণী, অভয়বাণী কর্ণে
কর পরশে কান্তি দিল পাণ্ডু দেহ বর্ণে।
পেয়ালা ভরি পিয়ায়ে মধু সঞ্জীবনী সরবৎ
লুকাল পরী হিরণ হুরী আলোকি মরু পর্ব্বত।
জড়িমা ভরা শ্রবণে রোগী শোনে কে বলে শূন্যে
আল্লা জেনো আহ্লাদিত ভকত তব পুণ্যে।
করেছিলে যে শ্যেন পাখীর চঞ্চু দুটী সিক্ত
দিন-দুনিয়া-মালিক কাছে হয়নি তাহা রিক্ত।

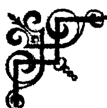


কাঁপিয়া উঠে গফুর হৃদি ভরা ভকতি হর্ষে
সহসা তার আবেশ ভাঙ্গে শীতল বায়ু পর্শে।

* * * *

চাহিয়া দেখে কোথায় মরু এযে মরুর উদ্যান
'আজান' গান আনিছে বহি নব দেশের সন্ধান।

—০—



অরুন্তুদ।

—০—

কাঁদায় মোরে প্রাতে শীতের মলিন শতদল,
কাঁদায় মোরে বৃন্তভাঙ্গা কোরক সুকোমল,
কাঁদায় মোরে সাঁজের রবির নয়ন ছল ছল
সবার চেয়ে কাঁদায় মোরে বুড়ার আঁখি জল।

———



মুখর আঁখি।

নির্দ্দয় মাতাল পতি বকে মারে দিবা রাতি
নীরবে সহিছে সতী সে পতিরতা,
অনাদর উপেক্ষায় শরীর শুকায়ে যায়
শিশিরের শীর্ণতনু নলিনী যথা,
সুধাইছে সখীদলে সতী হাসি নানা ছলে
লুকাইছে আপনার গোপন ব্যথা
আঁখি কোণে ম্লান রেখা কই পড়িলনা ঢাকা
প্রকাশ করিয়া দিল সকল কথা।
হায় রে মুখর আঁখি রাখিলিনা কিছু বাকি
লজ্জাবতী লতাটীর নোয়ালি মাথা,
হৃদয়ের অন্তঃপুরে শুকসারী তোরা কিরে
নতুবা এ গুপ্তকথা শুনিলি কোথা।



তবু ভুলিয়া থাকি।

—০—

তবু ভুলিয়া থাকি,
ধরণীর শোক দুখ নিয়ত পীড়িছে বুক
একে একে প্রিয় মুখ দিতেছে ফাঁকি,
হিয়ারে সান্ত্বনা দিতে কেহ নাহি অবনীতে
দীর্ঘ বেলা কেটে যেতে নাহিক বাকি
তবু ভুলিয়া থাকি।

(২)

তবু ভুলিয়া থাকি,
সুশ্যামল তরু লতা নিত্য কহে তাঁরি কথা
রাঙা রবি তাঁরি ছবি দিতেছে আঁকি,
অন্তহীন নীলাম্বুধি কর্ণে মোর নিরবধি
মন্দ্ররবে তাঁরি নাম কহিছে ডাকি
তবু ভুলিয়া থাকি।

(৩)

তবু ভুলিয়া থাকি

কখন পড়েছে রোদ হিয়া মোর কি নির্ব্বোধ

পশ্চিমেতে ডুবু ডুবু হয়েছে চাকি,

হল শেষ ডাক দেওয়া বন্ধ হতেছে খেয়া

মাঝি যে ফিরিছে তরী বাঁধিয়া রাখি,

তবু ভুলিয়া থাকি।

(৪)

তবু ভুলিয়া থাকি।

যে দিয়েছে শান্তি দুখে আনিনে সে নাম মুখে

ডাকি আমি কত জনে তাঁরে না ডাকি,

শোক তাপহরা শুচি অমৃতে হলনা রুচি

পাপ আটাকাঠি মাঝে পড়েছে পাখী

তবু ভুলিয়া থাকি।



উদাসীন।

—০—

আমার সুখের সাজান ভবনে
আমিই আজিরে প্রবাসী,
ছিন্ন আজিকে বন্ধন শত
আজি মন প্রাণ উদাসী।
নাই কোন আঁখি মোর তরে জাগি,
কোন দীপ নাহি জ্বলে মোর লাগি,
সাড়া পেয়ে কেহ ছুটে নাহি আসে
মম চুম্বন পিয়াসী,
আমার সুখের সাজান ভবনে
আমিই আজিরে প্রবাসী।

(২)

তরুলতা সব বুনো হয়ে গেছে
চিনিতে পারে না আমারে
পালিত কুকুর করে চীৎকার
ঢুকিতে দেয় না দুয়ারে।



চোক ফেটে মোর আসে যে মা জল,
কেমন ভিখারী সাজাইলি বল,
নয়নের আলো কেড়ে নিয়ে মোর
ফেলিয়া রাখিলি আঁধারে।
তরুলতা সব বুনো হয়ে গেছে,
চিনিতে পারে না আমারে।

(৩)

নৈশ সমীর শ্রবণে আমার
বলে বারবার ফুকারি,
ভগ্ন মেলার ত্যক্ত কুটীর
কি হইবে আর নেহারি।
সুখের সমাধি হেরিয়া কি হবে,
তোমার দেয়ালি নিভিয়াছে কবে,
সুদূর অতীত অন্নসত্রে
বৃথায় চলেছ ভুখারি
নৈশ সমীর শ্রবণে আমার
বলে বারবার ফুকারি।



খেয়াশেষে।

—০—

ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি,
ওগো পড়েগেছে বেলা, আমি যে এলাম দেরীতে
বল কে আনে তরণী ভিড়ি।
শুনি অনিবার করি শুধু ঘোর কলকল
ছুটে চৌদিকে ফেনিলোচ্ছল রাঙাজল,
ঘন বট ছায়ে বাঁধি তরীখানি
মাঝি গেল গৃহে ফিরি,
ওগো আজিকে তুফান ভীষণ তুফান নদীতে
এলো সাঁজের আঁধার ঘিরি

(২)

ওই জমে আসে গগণের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে ;
হের, রোষে ফুলে উঠে আবর্ত্তময় নদীবেগ
পারে কি পাবনা যেতে ?



যতবার দীপ জ্বালে দেববালা নভো গায়,
আজি দুর্য্যোগে শুধু বারবার নিভে যায়,
শিহরি উঠিছে ক্লান্ত এ দেহ
আঁধারে খেয়ার পথে,
ওই জমে আসে গগণের কোলে কালো মেঘ
ঘোর ঝটিকা উঠেছে মেতে।

(৩)

ওগো বহু দূর হ'তে বহু আশা করে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি'
মহা উৎসবে ভেটিব বারেক হৃদি রাজ
শত বন্ধন টুটি।
দূরে মন্দিরে শোভে ওই দীপ অগণন,
পূজার বাদ্য বহিয়া আনিছে সমীরণ,
আমিই কেবল রহিনু একাকী
তরু পাদ মূলে লুটি।
ওগো বহু দূর হতে বহু আশা করে আমি আজ
এসেছি এসেছি ছুটি।



(৪)

যাও সুখীদল যাও ডাকিবনা পিছু আর,
আমি এ পারেই থাকি,
এতখন ধরে কেন মিছামিছি এতবার,
করিলাম ডাকাডাকি।
শোভন অর্ঘ্য সবাই এনেছে ভাই—
পুলক অধীর আমি কিছু আনি নাই
রিক্ত এ করে ভেটিবনা হৃদিরাজ
আমি এ পারেই থাকি।
এতখন ধরে কেন মিছামিছি এতবার
করিলাম ডাকাডাকি।

(৫)

ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে,
বন্ধ হয়েছে খেয়া,
ভালই হয়েছে দেবতা চরণ পূজিতে,
ও পারে হল না যাওয়া।



যে পূজা অর্ঘ্য বহিয়া এনেছি হায়
সে যে গো কেবল আঁধারেই দেওয়া যায়,
সমারোহ মাঝে দীনের সে দান
যাবে না যাবে না দে'য়া।
ওগো ভালই হয়েছে তুফান উঠেছে নদীতে,
বন্ধ হয়েছে খেয়া।

সমাপ্ত।


INDIA PRESS, CALCUTTA.

UJANEE*

The story is recited, in ballad form, in a small Bengalee book called 'UJANEE' by a young Bengalee, poet, Babu Kumudranjan Mallik. It is a very recent publication, and I sincerely thank the author for sending me a copy of it. * * * Bengalee literature is very rich in poetry. * * * Babu Kumudranjan Mallick has, I think very clearly established his right to an honoured place in this Temple of Fame. He has not yet given us many poems, but the few that he has given, have in them not merely a high promise but a very great fulfilment also in the realm of the poetic art. Poetry has been defined in our literature as Rasâtmakam Vâkyam —रसात्मकँ वाक्यम i.e., words the very soul of which are the human emotions. Judged by this definition, Babu Kumudranjan's booklet deserves a very high place in our poetical literature. And the superiority of his poems lies especially in their homeliness and simplicity. He shows almost with a master's hand the simple grandeur of the inner soul of the unlettered Bengalee cultivator, whose whole life is lived in the midst of his own family and relations, in his humble hut, shaded by the outspreading branches of the mango or the jack-fruit

* Ujanee—By Kumudranjan Mallik B.A.: Published by the India Press, 24, Middle Road, Entally, Calcutta.

trees; covered with green, flowering creepers; protected from the impartinent and unsympathetic gaze of the stranger by thick bamboo bushes at the back and the perpetually flowering javâ, and other trees and creepers in front. We have had in our old poems, the holy amours of the gods. In our more modern poems we have had exquisite delineations of the complex and refined life and emotions of the men and women of our cities. But I do not know if with the exception of Mukundaram among our old and Rajanikanta among our modern poets, any one has tried, like Babu Kumudranjan, to paint with such faithfulness to details and such keen penetration into their inner soul, the life and love of our villages. Almost each one of the pictures that he has painted with such exquisite delicacy in this small book, is a revelation to me. And it shows that after all, there is more real life and love in the unlettered, and unshirted and unshoed, unsoaped and unscented, "unreformed" and "unenlightened" Bengalee villagers than in our carpeted and cushioned hybrid homes and city communities. Notwithstanding all our tall talks about civilisation and humanity, we city-people, are an incomparably meaner and coarser lot than the simple folks of our distant villages. Babu Kumudranjan has rendered a very signal service to his country and his generation, by giving us these lovely studies of the beauty and grandeur of our village life and associations, for it is these that must really form the plinth and foundation of our new and revived national life.

Ujânee is the name of a village in the Burdwan District. In naming his book after this village, the author wants us evidently to know and love his village and all its simple folks. In fact he says in the short preface, that most of the incidents related here are drawn from life. " It is the petty history of our petty village. They are commonplace pictures of commonplace lives." The young poet says all this in a spirit of humility. But they are nontheless true. And to my mind, this very commonplace character of the scenes and incidents that he has depicted with such exquisite skill, makes this book far more enjoyable and valuable than even the most attractive picture of our city-flirtations. In reading these poems one has the same sensation that the city-man living all his days in the close and dusty streets of his town feels, when, after long months, he goes out for a week-end to the green fields and the wide wastes, and scents the mango blossoms and hears the chirping of the birds and the chorus of rushing streams. I do not want the author to write many books, for I believe that who writes much must write lies. But I do desire to see him as one of the greatest poets of the New Renaissance in Bengal.

Ujânee contains 32 poems, each a sweet little picture in itself. I wish I could translate a good many of these in these pages. But time and space forbid the attempt. I shall, therefore, content myself by just giving a prose rendering of the first poem Chandali.

An old and lame Paria woman, to see the Divine Face of Jagannath on the Car, by herself she walks slowly and slowly along the Midnapore Road.

All through the day she only walks just a mile or two; what strange vow has she made—a hundred-two-miles' distance from her home she wants to go to Puridham.

Group after group the Puri-pilgrims go. Who takes note of his fellows? She falls behind them all, unable to walk up with them.

At last, when of the Car-Festival only two short days remained, with great pains she came at eve near the town of Katak.

Whither goest thou, old woman? Asked a way-farer of her. Going, my son, to see the Lord on the Car, the woman said. Softly smiling the stranger said —How shalt thou go, old woman; at break of day the festival comes, how wilt thou see?" Hearing this, in sudden anger, the Paria woman said—" A long way yet lies before me, and how darest thou to say at break of day, tomorrow, the festival comes; this cannot be."

Laughed the way-farer and said—Yes it is even so. Walk, mad woman, walk: if thou art not there who the Car will draw."

The old woman slept. At break of day, she rose and told herself—let's go on now. But pain there was in both her legs: she had not the power to rise.

Oh the pain! She cannot walk, yet she crawls on and on. To see the Divine Face on the Car, the old woman thus moved along.

Devotees all have gathered at Puri, it is the day of the Car-Festival. The Lord of the Poor has got upon the Car, adorned in new dresses.

But what is this? Strange and unheared-of-before! The Car of the Lord moveth not, though the ropes are being drawn by millions of devotees, and the road is plane and dry. Elephants were brought and tied to the ropes, yet the Car stood as fixed as ever.

Lost in anxiety, trembling with fear, with tears rolling down his cheeks, the chief of the Pandas fell prostrate on the ground, and in his trance saw a mighty Bhakta drawing the Car backwards.

As long the selfsame Bhakat touches not the front rope of the Car, a thousand elephants might be called to work, yet the wheels would not move by even the span of an inch. This he saw in his trance.

Out ran the hosts of Pandas in search of that mighty Bhakat. They brought mendicants many in their loin-cloth, many a saint and Vaishnava bedecked in Tilaka and wrapped in *Námâbalee*, and many a holy Brahmin too. But at touch of none that mighty Car would move even by the measure of a sesamum seed.

Searching near and searching far, at a long way off, at last, the Chief of the Priests saw, alas, a lame, old woman going Puri-wards.

The old woman crawls, and crawling moves. Asks the Priest,—"To whose door goest thou, woman, in this scoarching sun, to beg for alms?"

" The heated sands are burning thy feet, thy eyes are filled with tears. Take this silver, and go and rest under yonder banyan tree."

The old woman says,—" Tell me, father, when is the Festival of the Car. I want no silver. I long to see the Divine face on the Car, for this alone I am moving in the sun."

Thus addressed, the Brahmins burst out in tears and took the old woman up in his arms. And crying at the top of his voice " I have found," " I have found," —ran along the road to Puri.

The bewildered woman cried,—" Leave me, leave me, Father, a polluted Pariah woman I."

" Let me take the dust off thy feet, Mother, thou art the Guru of my Guru."! the Brahmin replied.

Then, of a sudden, the pilgrims shouted,—Victory ! Victory ! There comes the chief Priest, lo ! with a lame woman in his arms !

Fixed that Car, now commenced to move, so soon the old woman put her hand on it. In wild ecstasy the multitudes cried :—Blessed ! blessed ! Jagannăth "

With tearful eyes, with million voices, cried a million souls :—

True, True, Art Thou, The Lord of the Poor, Hari ! the Bhakta's Bhagavan !

BIPIN CHANDRA PAL,

Hindu Review.

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ,

প্রণীত।

উজানি।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

এক একটি গাথা শিশিরসিক্ত সেফালির ন্যায় মনোরম।

সুবিখ্যাত শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র পাল লিখিয়াছেন—"উজানি পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছি। প্রায় প্রত্যেক কবিতাই অপরোক্ষ রসানুভূতির ও সুসংযত কল্পনার পরিচয় দান করে। আমার পড়া শুনা বড় কম কিন্তু যতটুকু পড়া শুনা আছে তাহাতে 'উজানির' কবিতাগুলির মত এমন সরল এমন সরস অথচ গভীর ভাবপূর্ণ কবিতা অতি অল্পই পড়িয়াছি। প্রত্যেক কবিতা এক একটি বিশেষ রস চিত্রকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। যাঁর প্রেরণায় 'উজানির' এ রস ফুটিয়াছে তাঁহাকে কৃতজ্ঞ অন্তরে প্রণাম করি।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিত কুমার বন্দোপাধ্যায় এম, এ, লিখিয়াছেন—

পল্লীগ্রামে আমারও জন্মভূমি, তবে নানা দুঃখ ধান্ধার জ্বালায় সে মায়া প্রায় কাটাইয়াছি। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এখনও সেই 'চেন মাঠের' প্রতি একটু টান আছে। তাই তোমার "দীন পল্লীর মেঠো গান বড় মিঠে বাজিয়াছে—শুধু তাই কেন, কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়াছে। 'শ্রীমন' 'ঘোষাল পুকুর' 'নীহার', 'নোটন' 'ছিরু' 'অখিল মাঝি' রসিকবাগদী ঠিক যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি। 'রাম মশায়' Goldsmithএর অনুসরণে লিখিত হইলেও ইহাতে মৌলিকতার অভাব নাই।

সুলেখক শ্রীযুক্ত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বার-এট-ল লিখিয়াছেন—

উজানি পড়িয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। ভাব ভাষা সবই সুন্দর সবই মর্ম্মস্পর্শী। ছবিগুলি সুন্দর ফুটিয়াছে।

কাটোয়ার ভূতপূর্ব্ব বিখ্যাত সবডিভিসন্যাল অফিসর সুলেখক শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র রায় বি, এ, লিখিয়াছেন—

"উজানি বঙ্গ ভাষায় অমূল্য রত্ন হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে আপনার আসন দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। উজানির প্রত্যেক কবিতাই বঙ্গ সাহিত্যের অমূল্য সম্পত্তি এবং অমরত্বের উপযোগী। উজানি পাঠ করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। পুস্তকের শেষে আপনি যে সন্দেহের আভাস দিয়াছেন তাহার কারণ নাই। বঙ্গের রাজপ্রাসাদে ও দরিদ্রের কুটীরে আপনার উজানি সমভাবে সাদরে গৃহীত হইবে এবং আমার আশা আছে ভগবানের ইচ্ছায় আপনার নাম একদিন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবিগণের মধ্যে উল্লিখিত হইবে।"

হিতবাদী ঃ—ভাষা সরল সহজ ভাব মর্ম্মস্পর্শী ছবিগুলি সুন্দর। পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি।

ভারতী ঃ—উজানি—শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত। ইণ্ডিয়া প্রেসে মুদ্রিত। চক্রবর্ত্তী চাটার্জী কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এখানি কবিতা গ্রন্থ। গ্রন্থকার ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "অনেকগুলিই সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহা আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামের ক্ষুদ্র ইতিহাস সামান্য জীবনের সামান্য চিত্র।" গ্রন্থে ৩২টী খণ্ড কবিতা আছে। কবিতাগুলি সরল ও সহজ, ছন্দ মধুর, ভাষা মর্ম্মস্পর্শিনী ভাবও স্বচ্ছ, লঘু। লেখকের আন্তরিকতার গুণে কবিতাগুলি পল্লী হৃদয়ের সুখ দুঃখের ক্ষুদ্র কাহিনীর মধ্য দিয়া বেশ দীপ্ত অনাড়ম্বর মাধুর্য্যে ফুটিয়া

উঠিয়াছে, সকল কবিতাই সুস্নিগ্ধ, উপভোগ্য সেগুলি এতটুকু চমক লাগায় না, একেবারে প্রাণের কোমল তারে ঘা দেয়। বহিখানির ছাপা কাগজও রমণীয় হইয়াছে।

প্রবাসী ঃ—উজানি—শ্রীযুক্ত কুমুদ রঞ্জন মল্লিক বি, এ প্রণীত—গ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাসেও যে কত শিখিবার ভাবিবার উপাদান লুক্কায়িত থাকে তাহার পরিচয় এই গ্রন্থে পাওয়া যায়—ইহাই এ গ্রন্থের বিশেষত্ব। গ্রামের অজয় কুন্নুর নদী, হংসখেয়ারি অখিলমাঝি আদুরী ও ছিরু, রামমশায় ও নোটন আপন আপন চরিত্রের বিশেষত্ব লইয়া আমাদের নিতান্ত পরিচিত লোকের মত দেখা দিয়াছে। চণ্ডালীর দেবতার চাঁদমুখ দেখিবার একান্ত আগ্রহের পশ্চাত টানে 'যখন চলে না দেবের রথ' তখন প্রধান পাণ্ডা ভক্ত অন্বেষণে বাহির হইয়া দেখিল চলিবার শক্তি নাই তবু চাঁদমুখ দেখিতে "হামাগুড়ি দিয়া চলিয়াছে বুড়ী" পাণ্ডা চোখের জলে ভাসিয়া বুড়ীকে বুকে তুলিয়া লইল। তখন

ফুঁকর বৃদ্ধা বলে দাও ছাড়ি
বাবা গো চাঁড়ালি মুই,
ব্রাহ্মণ বলে দেমা পদধূলি
গুরুর গুরুদে তুই!

এমন কথা যে গ্রামের কবি গাহিতে পারেন তিনি নিজে ধন্য হইয়া গ্রামকে ধন্য করিবেন, এবং সেই হাওয়ায় সমস্ত দেশ সংস্কার বিমুক্ত শুদ্ধচিত্র হইবার পথে দাঁড়াইবে। কবির উদার প্রাণ শূদ্র ও গরিব চাঁদ সরকারের প্রতিমা পূজা হয় নাই বলিয়া তাহার দুঃখে কাতর ব্রাহ্মণ জমিদার কান্ত গাঙ্গুলীকে দিয়া যেমন বলাইয়াছেন—

চল খুড়া তাড়াতাড়ি
না যাউক কেহ আমি যাই
আমি যাব তব বাড়ী।

তেমনি আবার মঙ্গলকোটের পথে গাজি সাহেবের ভাঙ্গা মসজিদ—

আজ তার আধখানা তীরেতে দাঁড়ায়ে আছে
আধখানা কুলুরের গায়

দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বলিয়াছেন—

ভবনের মাঝ দিয়া নদী হয়ে বয়ে গেছে
শত নয়নের আঁখিজল !

আবার হরিশ পোদ্দারের ভাঙ্গা বাড়ীতে—

সব গেছে একমাত্র কন্যা আছে তার
ত্যক্ত গৃহ আঙিনায় সেফালির ঝাড় ।

দেখিয়া যেমন, আলি নওয়াজের তমসুক পোড়ানো ও গোলামের আধেক গড়া গোহাল খানি দেখিয়াও তেমনি দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়াছেন। গ্রামের নিকর্ম্মা ছেলে নোটনের আপন ভুলিয়া পরের সেবা রামমশায়ের 'বিদ্যাসাগ্যি' ; 'আমগাছ' ও 'ঘোষাল পুকুর' ছিরু ও শ্রীমন প্রভৃতির গেঁয়ো চিত্র বিচিত্র রসে উপভোগ্য হইয়াছে। শ্রীমনের

খেলতে শুধু ঝুল্ ঝাপ্পুর ডাণ্ডাগুলি খেলা
পলের মত চলে যেত দীর্ঘ দিনের বেলা
নীলকণ্ঠের যাত্রা যদি দু ক্রোশ দূরে হয়
সবার আগে তাহার সেথা না গেলেইত নয় ।

ইত্যাদি কাহিনী পাঠ করিতে করিতে পাঠকের মনের মধ্যে নিজ গ্রামের একটী তুল্য চরিত্র আকার ধরিয়া উঠে। ইহারা সব বাংলার পল্লী গ্রামের বিভিন্ন চরিত্রের এক একটী সদৃশ্য দৃষ্টান্ত Prototype মাত্র।

* * * * *

এই পুস্তকখানিতে কাব্য রসিক সমাজে সমাদর পাইবার বিশেষ যোগ্যতা আছে।

প্রসূণ ঃ—উজানি—শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রণীত ইহার পূর্ব্বেই কবি শতদল ও বনতুলসী মার চরণে অর্ঘ্য দিয়াছেন। এখানি তাঁহার তৃতীয় কাব্য গ্রন্থ।

'উজানি' একখানি ছোট গ্রাম, বর্ত্তমান নাম 'কোগ্রাম'। ইহার কোলটী বেড়িয়া 'অজয়' ও 'কুনুর' প্রবাহিত। এখনও সেই 'খড়্গ মোক্ষণের' মাঠ ও বিজন 'ভ্রমরাদহ' অতীত স্মৃতি বুকে করিয়া বিরাজিত। সত্যই উজানি গ্রাম খানি ছোট হইলেও বহু স্মৃতিজড়িত স্থান ও দ্রব্যের ধাত্রী। সেখানে গেলে আমরা ভুলিয়া যাই যে, আমরা বিংশশতাব্দীর মানুষ। মনে হয় যেন বহু শত বৎসরের পুরাতন একখানি গ্রামে আমরা প্রবেশ করিয়াছি। যাহার ধূলি সাধু পদরজ পূত, যাহার পথ, ঘাট, মাঠ অলৌকিক ঘটনা বিজড়িত, এবং যাহার সহিত বর্ত্তমান বিলাস ব্যসনময় জীবন একেবারেই মিলে না।

কবি একটী একটী করিয়া গ্রামের বিস্মৃত কাহিনীগুলিকে তাঁহার হৃদয়ের শোণিতে উজ্জ্বল করিয়াছেন।

বহুদিন ধরিয়া লোকে নদীর কূলে একটী আলো দেখিয়া আসিতেছে; জানেন না কিসের আলো, কেনই বা ঝড়, বৃষ্টি বাদল না মানিয়া রোজই জ্বলে।

লোকে না জানুক, কবি জানেন যে এক অভাগিনী মাতা সারা-জীবনটী ধরিয়া নিরুদ্দেশ পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় প্রতি রাত্রি দীপখানি জ্বালিয়া জাগিয়া রহিতেন। প্রত্যুষের স্নিগ্ধ সমীরণ বিধাতার নির্ব্বাক্ সান্ত্বনার মত যখন তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া জানাইয়া দিত রাত্রি শেষ হইয়াছে, তখন মাতা শূন্য নয়নে আকাশের পানে চাহিতেন। সারা-জীবনভোর প্রতীক্ষার পরও যখন অভাগিনী সন্তানের চাঁদমুখ দেখিতে না পাইয়া মরণের কোলে ঘুমাইয়া পড়িল, তখন বিধাতা তাঁহার অমর হস্তে অভাগিনীর আলোকটী ধরিলেন, তাই সে আলো আর নিবিল না।

সে মা আর নাই,—

তবুও জ্বলিছে, জ্বলিবে এখনো
কত নিশি নাহি জানি,
ভাবনা জড়িত জননী হিয়ার
স্নেহের প্রদীপ খানি।

"সতী" চিত্রে কবি একটী পল্লী সতীর পবিত্র আত্মাহুতির কথা ছন্দোবদ্ধ করিয়াছেন।

ফাগুন রাতে গ্রামবাসী যে মধুর বীণার ধ্বনি শুনিতে পায়, সে সতীর কণ্ঠস্বর, তাঁর লাজাঞ্জলি দ্রোণের ফুলে ছড়িয়ে দিয়ে ধন্য হয়, নিশার নীহার তাঁহারই অশ্রুবিন্দু সাথে মিলিত হইয়া পবিত্র হয়।

সতী যখন এ দেহ ত্যাগ করিলেন তখন—
উঠ্‌লো জ্বলি রক্ত চেলি রাঙিয়ে দিয়ে বৈশ্বানর
বাজ্‌লো ঢোল ও সানাই কাঁসি যত,
পুড়্‌লো হোমের অপরাজিতা লক্ষ লোকের চোখের পর
ছড়ালো খই গ্রামের বালা যত।

পল্লীর গৃহে গৃহে এখনও তাহার সিন্দূর খই ভক্তির সহিত রক্ষিত।

পরীরা হুলুধ্বনি দিয়া নিশি শেষে পূর্ব্বাকাশে আজও সিঁদুর ছড়াইয়া যায়, আর সতীর সিঁথার সিঁদুরটুকু পরিয়াই বালরবি আজও এমন অরুণ বর্ণ। সমস্ত বিশ্ব আজ যে সতীর আত্মোৎসর্গ দ্বারা পবিত্র, কবি তাহাই মনোরম ভাবে দেখাইয়াছের।

আমাদের কবির হৃদয়ে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্র নাই—মন আকাশের মত উদার, শরতের মেঘের মত নির্ম্মল।

"দেয়ালি" চিত্রে আলি নওয়াজের যে ছবি তিনি আঁকিয়াছেন, তাহা শুধু মুসলমানের কেন সকল হিন্দুরও প্রীতি শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে, কৃতজ্ঞ বিজয় যখন আলি নওয়াজের তমস্থক খানি বাতিতে পোড়াইয়া

রোসনাই' করিল, তখন শুধু আলি নওয়াজের বিশাল নয়নই জলে ভাসিয়া যায় নাই, প্রত্যেক সহৃদয় পাঠকের চক্ষুই অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে।

কবির আর একটী গুণ আছে—সে তাঁহার আন্তরিকতা। তিনি যাহা বলিতেছেন, তাহা যে তিনি হৃদয় দিয়া প্রগাঢ়ভাবে বোধ করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুভবকরা যায়; তাঁহার এই আন্তরিকতার জন্য তাঁহার পদ্যের এমন একটী মাধুর্য্য ও আকর্ষণী শক্তি আছে, যাহা কাব্যে সচরাচর সুলভ নহে।

কবির 'চণ্ডালী' সাধকের আদরের ধন। বেচারী খঞ্জ, তবু শ্রীমুখ দেখিবার প্রবল আগ্রহে হামাগুড়ি দিয়া পথ ঠেলিয়া চলিয়াছে। রৌদ্রে, তপ্ত বালুতে, আঁখি জলে ভরিয়া গেছে; তবু রথেতে চাঁদমুখ দেখিবে বলিয়া বুড়ী চলিয়াছে। হউক না আজ রথের দিন, এমন ভক্ত যখন অনুপস্থিত, তখন ভক্তবৎসলের রথ কি কখনও চলিতে পারে? তাহা হইলে তাঁহার নামে যে কলঙ্ক হইবে। তাই সে বিরাট রথ "থির" রহিল। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ হস্তীও তাহা নড়াইতে পারিল না। অনেক সন্ধানের পর বিপন্ন প্রধান পাণ্ডা যখন সেই খোঁড়া চণ্ডালীকে কোলে লইয়া আসিলেন, তখন তাহার পূতস্পর্শে সেই দেবদেবের বিরাট রথ চলিতে লাগিল। জয় জগন্নাথ!

কবির লেখনীর উপর পুষ্প চন্দন বর্ষিত হউক, তিনি যেন এইরূপ ভাবেই সহজ কথায় ভক্তিতত্ত্বের সার উপদেশগুলি বঙ্গবাসীকে উপাহার দেন।

ভিখারী "চন্দ্রকান্ত" আর একটী ভক্তের ছবি। গ্রামের অন্যান্য লোকের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত শ্রীবৃন্দাবন চলিয়াছেন। গরীব তিনি, শুধু শ্রীভগবানের চরণমাত্র সম্বল। ব্রজধাম দর্শনের এমনি প্রবল আকাঙ্ক্ষা যে, মন আগেই সেখানে গিয়াছে, তাই—

হেরিবার আগে নেহারে মানস
নিবিড় তমাল কুঞ্জ
যেথা শুক সারী গাহিছে মধুর
বাজিছে কাঁকন ব্রজের বধূর
শুনি রাধিকার চরণ নূপুর
ফুটিছে কুসুমপুঞ্জ।

মানস-নেত্রে ভক্ত সবই দেখিতেছেন, সবই অনুভব করিতেছেন, কখনও বা দোল রাস দেখিতেছেন, কখনও বা বনকুসুমের গন্ধ পাইতেছেন, কখনও বা মধুর বংশীধ্বনি শ্রবণ করিতেছেন। এইরূপে দিনরাত্রি কাটিতে লাগিল, পথও ফুরাইয়া আসিল। আজ তার শেষ, চন্দ্রকান্ত আনন্দে আত্মহারা যে শ্রীবৃন্দাবন পঁহুছিতে আর দেরী নাই।

চন্দ্রকান্ত ভাবে বারেবার
রজে গড়াগড়ি দিবে দেহ তার
একি আনন্দ পুলক অপার
জাগিয়া কাটিল রাত্রি।

কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর বিধি! ভক্তের বুঝি আর শ্রীমুখ দর্শন ঘটে না। সহসা মৃত্যুর আহ্বানে বিসূচিকাগ্রস্ত হইয়া চন্দ্রকান্ত অমরধামে প্রস্থান করিল। সঙ্গের যাত্রীরা তাঁহাকে ফেলিয়া পূর্ব্বেই বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গীতগোবিন্দ শ্লোক গাহিয়া গাহিয়া কেই ওই কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিতেছে? কাহার মূর্ত্তি একবারে শ্রীহরির পাদপদ্ম লগ্ন হইয়া রহিয়াছে? আহা, ও যে চন্দ্রকান্ত! সকলে সভয়ে সভক্তিতে মাথা নোয়াইয়া মনে মনে বলিল, চন্দ্রকান্ত তুমিই ভক্ত! তোমার দেখাই সার্থক!

বন পরিক্রিয়া শেষ করিয়া সকলে আজ গৃহে ফিরিতেছে। তাহারা শুনিল কে যেন ডাকিয়া বলিতেছে—

রহিনু বন্ধু যাবনাকো আর
কুঞ্জেতে ঠাঁই হয়েছে আমার
শুধু তোমাদেরি পুণ্যে।

কি সুন্দর এই ভক্তের চিত্র। সমস্ত হৃদয় মন এক স্বর্গীয় আনন্দে অভিষিক্ত হয়, মানুষের উপর ভক্তি হয়, ভগবানে বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

বাঙ্গালীর মেয়ের স্বামীর ঘর করিতে যাওয়ার একখানি নিখুঁত ফটো আমরা "বিমলায়" পাইয়াছি। এ ছবি পুরাতন হইলেও চির নূতন। * * "অখিল মাঝি" কবির একটী সুন্দর সৃষ্টি। আজ কালকার দিনে এরূপ সন্তুষ্টচিত্ত, সদানন্দ পুরুষ দুর্লভ। একদিন ছিল, যখন সোনার বাংলার কোন অভাবই ছিল না—সুজলা সুফলা বাংলা ধনধান্যে পরিপূর্ণ ছিল—তখন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে এইরূপ সদানন্দচিত্ত পুরুষ মিলিত। কিন্তু এখন আমাদের জীবনযাত্রা অন্য পথে চালিত হওয়ায় এরূপ সন্তোষামৃত তৃপ্ত পুরুষ ত মিলেই না, উপরন্তু আমাদের মন নব্য-শিক্ষায় এরূপ ভাবে গঠিত হইয়াছে ও হইতেছে যে, এরূপ লোকদিগকে শ্রদ্ধার চক্ষে—ভক্তির চক্ষে দেখিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করিতেছি।

সন্ধ্যাবেলার আঙ্গিনায়
জাল বুনে আর গাহে—
সুখে আছি আমি হরি হে
অভাবেরে আমি ডরিনে
আমার হিংসা করেনাক কেউ
আমিও হিংসা করিনে।

এরূপ ভাবে জীবনযাত্রা বিংশ শতাব্দীর সভ্যতানুমোদিত না হইতে পারে, কিন্তু সে কালের গ্রাম্য জমিদার বাবুও এরূপ শান্ত নিশঙ্ক জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তিনি বলিয়াছেন—

জগতের মাঝে শুধু তোর
হিংসা করি রে আমি।
জমিদারী দিয়ে ডিঙ্গিখান
নিতে সদা আছি রাজি
বিনিময়ে তোর মত প্রাণ
পাই যদি ওরে মাঝি।

জমিদার বাবুর মত আমাদেরও এই সুদুর্লভ জীবনের প্রতি হিংসা না হইয়া থাকিতে পারে না।

"মুক্তপাখী"তে কবি একটি কৃপণের কথা বলিয়াছেন।

আমরা অনেক সময় মানুষকে বুঝিতে ভুল করি। হয়ত সারা জীবনে আমরা একটি মানুষকে চিনিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই মরণের শীতল করস্পর্শে সে নিন্দা প্রশংসার অতীত হইয়া গেল, সেই আমরা বুঝিতে পারিলাম কি ভুলই হইয়াছিল!

পাখীটী যখন খাচায় আবদ্ধ ছিল, তখন মুক ভাবিয়া কত যন্ত্রণাই না দিয়াছি।

"আজ উড়ে গেল যবে
কাঁদাইয়া গেল সবে
শেষ সঙ্গীত হৃদে অঙ্কিত
রহিল গো চিরতরে।"

কৃপণ জীবনভোর অবজ্ঞা সহিয়াছে, আজ তাহারই টাকায় দেশের সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবে!

প্রত্যেক চিত্রেই কবির পর্য্যবেক্ষণ শক্তি, উদার সহানুভূতি ও সত্যের প্রতি একান্ত অনুরক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যখন শিক্ষা দেন তাহা এমনি সহজ সরল ভাবে দেন যে, বুঝিতেই পারি না যে তিনি কোন নৈতিক সত্য আমাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিতেছেন।

"কাপলিক" চিত্রে আমরা দেখিতে পাই, এক ষোড়শ বৎসরের যুবা মহাসিদ্ধির আশায় তপস্যারত। শত প্রলোভনে চিত্তস্থির হিমগিরির মত অটল। এমনি জিতেন্দ্রিয় যে, নারীর সহস্র প্রলোভনেও সংযমী চিত্ত অচল।

এই নবীন তাপসের নিকট সমস্ত প্রলোভন ব্যর্থ হইলে মায়া যখন তাঁহার মাতৃ মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া যুবার শৈশবের নাম ধরিয়া ডাকিলেন, তখন সেই স্নেহ-কণ্ঠোচ্চারিত আহ্বানের নিকট তাপসের কঠোর সংযম ভাসিয়া গেল। এস্থলে আমরা কবির নিজের ভাষা তুলিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

"তার পরে শ্রান্তপদে একাকিনী সুমন্দ গমনে
আসিল কি এক মূর্ত্তি সন্ন্যাসীর মানস নয়নে,
ক্ষীর ধারা বহে স্তনে, দুটী চক্ষু জলে গেছে ভরি
ডাকিল সে সন্ন্যাসীর শৈশবের ডাক নাম ধরি।
চমকি উঠিল যোগী সে মধুর সে করুণ স্বরে
যুগযুগান্তের কথা আজ যেন জাগিল অন্তরে।

* * * *

বিস্ময়ে মেলিল আঁখি, সব শূন্য, অট্ট অট্ট হাসি
ভাঙ্গি তাপসের ধ্যান পলাইল নিরাশা রাক্ষসী।"

যোগী সাধনভ্রষ্ট হইলেন। তিনি সাধনভ্রষ্ট হইয়াও যে দেবত্বের আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন, তাহাতে আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা এই যোগভ্রষ্ট নবীন তাপসকে মাথায় করিয়া মাতৃত্বের গৌরব ঘোষণা করিব।

নবীন সাধক যখন সাধনভ্রষ্ট জীবন "ভ্রমরাদহের" কালো জলে বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত, তখন

"আরাধ্যা মঙ্গলা মাতা হাসি হাসি দুটী কর ধরি
অবশ সাধক দেহ রাখিলেন নিজ ক্রোড়ে করি।

বলিলেন—

'ব্যর্থ নহে তোর পূজা, দেব গ্রাহ্য সার্থক সুন্দর।
প্রীতা আমি, উঠ বৎস, লভ নিজ আকাঙ্ক্ষিত বর ॥
স্নেহ প্রেম প্রীতি হীন কর্কশ কঠিন কারাগার।
হয় না হয় না কভু দেবতার বিলাস আগার ॥
আপনার জননীরে, জেনো বৎস, পারে যে ভুলিতে।
বিশ্ব-জননীর স্নেহ সে কখন পারে না লভিতে ॥

শেষ চারিটী ছত্রের তুলনা নাই। রাশি রাশি শুষ্ক উপদেশ অপেক্ষা ইহার মূল্য ও শক্তি অধিক।

আমাদের প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল। আরও অনেক কথা বলিবার থাকিলেও স্থানাভাবে নিরস্ত হইতে হইতেছে। পল্লী-জীবনের প্রত্যেক চিত্রের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রতিচ্ছবি কবি একটী একটী করিয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন।

কবির কাব্যের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব এই যে, তাহা আমাদেরই ঘরের কথা। যাহাদের বিষয় তিনি লিখিয়াছেন, তাহারা আমাদের সুপরিচিত। হায়, কোথায় গেল সেই শান্তিময় জীবন, সেই সরল প্রাণ, সেই আপন ভোলা ভালবাসা! আজিকার দিনে এ সকলি স্বপ্ন মনে হয়। কবি তাঁহার অমর তুলিকা স্পর্শে যাঁহাদিগকে সজীব করিয়াছেন, তাঁহারা যে আমাদেরই নিতান্ত আপনার, এমন দিন হয় ত আসিবে যে, আমরা ইহা সহজে বুঝিতে পারিব না।

গ্রন্থ শেষে কবি 'দীন পল্লীর মেঠো গান' বলিয়া যে দীনতা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার বিনয়ের পরিচায়ক সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি

সত্যের সম্মান রক্ষা করেন নাই। আমাদের জানিতে ইচ্ছা হয়, রাজধানীর কোন বীণাতন্ত্রীতে এমন সুন্দর স্বরলহরী ঝঙ্কৃত হয়। ইহাতে যতখানি অনাবিল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, রাজধানীর সযত্ন পালিত উদ্যান-কুসুমে তাহার একান্তই অভাব। * * *

শ্রীবসন্তবিহারী চন্দ্র, এম-এ।

বিজয়া

উজানি বাঙ্গালার ক্ষুদ্র গ্রামের ইতিহার। একবার, দুইবার বারবার পড়িয়াছি। বুকের ভিতর স্পন্দন আসিয়াছে, চ'কে জল আসিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত হইয়াছে। ভাষার ভিতর দিয়া, ছন্দের ভিতর দিয়া, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘটনার আলেখ্যের ভিতর দিয়া, এ কার চির নূতন চির পুরাতন কণ্ঠ, একার সন্তাপহর স্পর্শ, পাঁজর কাটা বেদনা করুণতা মাখা আশীর্ব্বৃষ্টিদায়ী দৃষ্টি। জানি না বঙ্কিম বাবু কি অর্থে লিখিয়াছিলেন "খাঁটি বাঙ্গার কবি আর হইবে না, হইবার কাজও নাই।" কিন্তু কুমুদ বাবু বঙ্গ জননীর খাঁটি হৃদয় টুকুর পরিচয় কোথা হইতে পাইলেন—এমন করিয়া আমাদের বিশ্রান্ত বিমুগ্ধ চক্ষের সমক্ষে তাঁহার জীবন্ত ছবি টুকু কি করিয়া ধরিলেন—তাহা বলিতে ভাষা মূক হইয়া যায়। তাঁহার "বনতুলসী" ও "শতদলের" আঘ্রাণ আমরা পাই নাই, তবে ভরসা আছে বাঙ্গালার ঘাটে মাঠে আরো অনেক কুসুম আছে, আরও অনেক সৌন্দর্য্যের আধার আছে, তিনি তাহার সর্ব্বস্ব ঐ হৃদয়ের সোনার কাঠি দিয়া তাহাদের সজীব করিয়া আমাদের সমক্ষে আনিয়া ধরিবেন। ভাষার আড়ম্বরে তাঁহার পরিচয় দিয়া আমরা তাঁহার কবি হৃদয়ের অবমাননা আর করিতে চাই না।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ শেট, বি, এল ;

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক বি, এ, প্রণীত

শতদল।

মূল্য তিন আনা।

এক শত সৌরভময় দলে পূর্ণ। কবিবর রবীন্দ্রনাথ, সার গুরুদাস, অধ্যাপক ললিতকুমার, সুলেখক প্রভাতকুমার প্রভৃতি কর্ত্তৃক মুক্তকণ্ঠে প্রসংশিত। চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং, ১৫নং কলেজস্কোয়ার ও ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য।

সাহিত্যসম্রাট—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন ঃ—

"আপনার প্রণীত শতদল পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ইহার ছোট ছোট কবিতাগুলি মৌচাকের ছোট ছোট কক্ষের মত রসপূর্ণ হইয়াছে। কখনো কখনো মৌমাচির হুলের ও বেশ পরিচয় পাওয়া যায়।"

স্বনামধন্য অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ, বিদ্যারত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—

"শতদল একশত দলই আঘ্রাণ করিয়াছি। ভাবুকতার মৃদুসৌরভে ইহা প্রকৃতই পদ্মের সহিত উপমেয়। আজকালকার বিকট প্রেমের কবিতায় যে একটা কাঁটালে চাঁপার উগ্রগন্ধ পাওয়া যায় ইহাতে তাহা নাই। শতদল আদরের বস্তু হইয়াছে, বহুবার পড়িলেও এরূপ কবিতা পুরাতন হয় না। এ নাটক নভেল প্লাবিত দেশে এরূপ ভাবুকতাময় ক্ষুদ্র কবিতার পাঠক যুটিবে কি? * * *

প্রসূণ ঃ—'শতদল' ঠিক শতদলের মতই ফুটিয়া আছে। স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধে ও অমল সৌন্দর্য্যে আমাদিগের প্রাণে বিমলানন্দ প্রদান

করিতেছে। কবির এই পুস্তকে আমরা [redacted]
সহৃদয়তার পরিচয় পাই। সমস্ত পুস্তক [redacted]
ভাব আছে তাহা শতদলের পবিত্রতা অ [redacted]
গৃহে এ পুস্তকের আদর হউক, শিশুকণ্ঠে [redacted]

শ্রীযুক্ত কুমুদরঞ্জন মল্লিক [redacted]

বনতুলসী।

মূল্য পাঁচ আনা।

কবি হৃদয়ের ভক্তি-চন্দনমাখা এক শত [redacted] সাহিত্যে অপূর্ব্ব।

অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় [redacted] লিখিয়াছেন—'বনতুলসী' পড়িয়া বিষয়বা [redacted] 'বনতুলসী' মাথায় রাখিবার জিনিষ। [redacted] বলিয়াছি এবারও তাহাই বলিতে ইচ্ছা হয় [redacted] দিনে বনতুলসীর আদর হইবে কি? তবে [redacted] তুলসীর ভক্ত হইতেছেন, ত্রিপত্রের গুণ [redacted] সৌষ্টবও সুন্দর হইয়াছে।

ভারতী ঃ—বনতুলসী শ্রীযুক্ত কুমু [redacted] মূল পাঁচ আনা। এক খানি কবিতা গ্রন্থ। [redacted] আধ্যাত্মিক ভাবে পরিপূর্ণ। * * পা [redacted] ছন্দে লেখকের বেশ অধিকার আছে—ভা [redacted] এই নবীন কবির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি কাম [redacted] সার্থক হইয়াছে।

[illegible] পূর্ব্বে বিরচিত শতদলের সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে [illegible] —তাহাতে মধুও মিশিয়াছিল সম্প্রতি তিনি [illegible] ভারতীর পূজার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন [illegible] । আমরা এই ক্ষুদ্র কবিতা গ্রন্থ পাঠে পরম [illegible] মহাপুরুষগণের যে বাণী ছন্দোবদ্ধ করিয়া [illegible] মিশাইয়া এ পূজার ডালি সাজাইয়াছেন, আশা [illegible] দেবতার আশীর্ব্বাদ আনয়ন করিবে।

বঙ্গদর্শন।

[illegible] শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে 'নিদারুণ শোক সায়কের [illegible] শ্রীহরির চরণোদ্দেশে যে অশ্রুসিক্ত ব[illegible] তাহা মনে করিলে প্রাণে গভীর সহানুভূতি [illegible] এরূপ ব্যাকুলতা ও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা [illegible] কবিরই নিজস্ব ছিল। সহজ কথায় গভী[illegible] [illegible]র অসাধারণ।

প্রসূণ।

ভরা প্রাণে

ভেবেছিলাম তোমার কথা বলবো নাকো জনে জনে ;
রইবে ঢাকা চিরদিন তা মনে মনে।
মন যে এমন উঠবে ভরে' জানবো তখন কেমন করে' ?—
ছাপিয়ে উঠে পড়বে সে যে ক্ষণে ক্ষণে ?

যেদিন মধু সঞ্চারিল মরম-ফুলে সঙ্গোপনে,
ভেবেছিলাম জানবে না কেউ বিশ্বজনে।
তখন কেবা জানতো আগে মধুর সনে গন্ধ জাগে,—
এমন করে' ছড়ায় পাগল সমীরণে ?

ভেবেছিলাম সাঁঝের ঘোরে যমুনাতে জল ভরিয়ে
ফিরবো ঘরে একা বিজন পথ ধরিয়ে ;
সোনার কুম্ভে কাঁকন লেগে মধুর ধ্বনি উঠল জেগে,
ভরা কলস চলার বেগে ছলছলিয়ে।

ভেবেছিলাম জীবন-ভরা মোদের চুমা গোপন ঘরে,
জানবে না তা আর তো কেহ ঘরে পরে ;
আঁধারের ওই বুকের মাঝে ধ্বনি তাহার এমন বাজে,
উঠল জ্বলে তারার হাসি আকাশ ভরে'।

অসীম অভিসার

ভেবেছিলাম বাঁধবো তোমায় আমার গানে চিরতরে ;
বিশ্বজনে দেখবে মুগ্ধ নয়ন ভোরে।
তুমি যে কী কতখানি জানবে সবাই অবাক্ মানি,
সবার হৃদয়-কুসুম পায়ে পড়বে ঝোরে।

চির অথির তোমায় আমি বেঁধেছি কি কেই বা জানে ?
নিত্য তুমি বহিয়া যাও আমার গানে।
ছন্দ তোমায় তটের মত বাঁধতে চাহে সীমায় যত
ততই বেগে ধাও যে তুমি অকূল পানে।

এমনি কোরে গান যে আমার দূরে হ'তে চলছে দূরে;
বাঁধবে তোমায় ধরবে তোমায় আপন সুরে।
হায় রে মিছে বাঁধার আশা পিছে পড়ে রয় যে ভাষা,
এই ধরণীর সীমায় সে যে মরে ঘুরে'।

যেদিন তুমি মিলবে গিয়ে প্রেমের অকূল পারাবারে ;
গান কি আমার থেমেই যাবে একেবারে ?
স্তব্ধ হবে সকল কথা তবু কি তার মরম-ব্যথা
যাবেই নাকো তোমার অসীম অভিসারে ?

১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

প্রিয়

তোমায় আমি আবেগভরে প্রিয় নামে যতই ডাকি,
মনে হয় যে কোথাও যেন রয় গো ফাঁকি।
হাজার জিনিষ আছে প্রিয় তাদের মাঝে তুমিও কিও,
আমার রুচির আরামের মোর খেয়াল তা কি ?

কেবল প্রিয়-ভাবে প্রাণের যায় কি মিটে' সকল দেয় ?
নও কি তুমি জীবনের মোর পরম শ্রেয় ?
তোমার কঠিন রুদ্র যাহা হয়তো প্রিয় নয়গো তাহা,
তব গভীর ভালবাসা নয় কি সেও ?

প্রিয়ের সুরটি বাজে নিতি একটি তারে প্রাণের বীণার ;
বীণায় যে মোর রয়েছে তার আরো হাজার।
তাদের প্রাণের চির ব্যথা জাগাতে চায় তোমার কথা,
জানাতে চায় তুমি আমার তুমি আমার।

নও তো শুধু প্রিয় মধুর, তুমি প্রচুর তুমি অপার ;
সকল ভাবে সকল রূপেই তুমি আমার।
জাগিয়ে মোর সকলখানি আপন মাঝে নিয়ে টানি
চির জুড়ান জুড়াবার যে অকূল পাথার।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

তুমি আমি

তোমার আমার জনম হ'ল এক নিমেষে একই ক্ষণে,
যেমনি দেখা হ'ল আমার তোমার সনে।
ধরণীর এই গর্ভ আঁধার ছেড়ে নব জনম দোঁহার
অলোক লোকের মুক্ত আলোক সমীরণে।

তুমি ছিলে তাহার আগে তোমার অলীক স্বপন সম,
আমার মায়ার মত অফুট চেতন মম।
ছুটি প্রাণে পরশ লেগে এমনি আলো উঠল জেগে
সেই আলোতে মিলিয়ে গেল মায়ার তম।

'আমি' সে যে শূন্য আঁধার চেতনবিহীন, 'তুমি' বিনে,
'তুমি'র মাঝে আপনারে সে লয় যে চিনে।
এই চেনা কি যাবে থামি? অসীম 'তুমি' অসীম 'আমি';
দোঁহার মাঝে দোঁহার বিকাশ রাত্রি দিনে!

জনম মোদের এক নিমেষে, বিকাশ সে যে একই সনে,
মরবো যখন মরবো মোরা এক মরণে।
"আমি" "তুমি" যদি মিলায় লুপ্ত হবে সকল লীলাই,
কোথাও কিছু রবে না শেষ এই ভুবনে।

১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

জ

ধরণীর প্রেম

ধরণীর সব ভালোবাসা রূপ ধরেছে একটিখানে,
তোমার দেহে মনে প্রাণে ;
সকল রস আর সকল পরশ সকল গতির বিপুল হরষ
মিলে বরণ গন্ধ গানে।

ঘিরলে মোরে ফেললে ঢেকে সেই সে স্নেহের আবরণে
যতনে সন্তরপণে।
পত্রপুট সে যেমন ঢেকে কুঁড়িটিরে দেয় গো রেখে
বুকের মাঝে বুকের ধনে।

বাড়ছি আমি উঠছি জেগে, ফুটছি নিতি থরে থরে,
অজানা কোন্ হরষভরে ;
যতই বেড়ে উঠে গন্ধ তোমার বুকেই রয় সে বন্ধ,
বুক যে তোমার ব্যাকুল করে।

এই যে স্নেহের আবরণে বুকের মাঝে এমন পালো ;
আহা সে কি লাগছে ভালো !
প্রাণে সদা শঙ্কা উঠে এ আবরণ যদিই টুটে
ডুবিয়ে দেয় বিপুল আলো।

তবু জানি ফাটবে ও-বুক ফাটবে নিবিড় ব্যথা-ভরে
পত্রপুট সে পড়বে ঝরে'।
ধন্য করি এই আবরণ হাসবে আলোয় বুক-চেরা ধন
অশ্রু তব বক্ষে ধরে'।

১৯শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

অভয়

গ্রাসে যদি গ্রাসুক আঁধার আসে আসুক করাল নিশি,
জগৎ-জোড়া মসীর লেপে আলোর লেখা যাক্ না মিশি ;
আকাশ-ভরা অযুত তারা সবগুলি তার ঢাকুক মেঘে,
শিকল-ছেঁড়া পাগল হাওয়া বেড়াক ছুটে অধীর বেগে।
সকল পাখীই নীরব ভয়ে অশুভ ঘোর পেঁচার রবে,
মনেও নাহি পড়ে গো হায় ফুটেছিল ফুল যে কবে।
করবো না ভয় মরবো নাকো ত্রাসের হিমের কাঁপন ধরে' ;
আপন ছায়া আঁকড়ে ধরে' রইবো না ভাই রুদ্ধ ঘরে।
ঝড়ের বেগেই পড়বো গিয়ে এলোমেলোর বুকের মাঝে,
আমার প্রাণের বেগের কাছে ঝড় সে নত হবেই লাজে।
যতই ঘুরুক ঘূর্ণা বায়ু জানি আমি আছেই আছে,
স্থির ধ্রুব অটল বিন্দু গভীর তাহার বুকের কাছে।
সকল বল মোর জাগিয়ে তুলে' চলবো আমি উজান টানে,
যতই ঘুরাক ঘূর্ণা মোরে ঘুরাবে সেই ধ্রুবের পানে।

অটলের ওই বুকের মাঝে পাবোই আমি পাবো যে ঠাঁই,
এমন মত্ত উন্মাদনায় ঝঞ্ঝা আজি জেগেছে তাই।
ওগো নিবিড় তিমির নিশি, ওগো আঁধার ওগো কালো,
মিছে তোমার ভয় দেখানো তোমায় আমি চিনি ভালো।
তোমার মাঝে ডুব দিব গো, তলাবো গো মনের সুখে,
ঘনিয়ে যত আসবে কালো হরষ তত নাচবে বুকে।
বুঝবো তত আর দেরী নাই, এগিয়ে ওই যে আসছে কাছে,
যেথায় তোমার বুকের রতন উষার আলো লুকিয়ে আছে।
অভয়-ভরা সেই আলো যে বুকের মাঝে ভরিয়ে নিবো,
ভুবনব্যাপী ভয়ের মাঝে ছড়িয়ে দিবো ছড়িয়ে দিবো।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

পিছনের বাঁশী

সমুখ পানে চলছি মোরা চলছি মোরা প্রাণের টানে
পথ বা অপথ শেষ বা অশেষ কেই বা জানে?
ওগো পিছন করুণ সুরে তোমার বাঁশী ঘুরে' ঘুরে'
কেন উদাস বিষাদ আনে তরুণ প্রাণে?

আপনি চরণ থেমে আসে অচেনায় আর চলতে না চায়,
ফিরতে সে চায় অতীতের ওই সোনার খাঁচায়!
মরণের ঠিক বুকের মাঝে নিত্য দোদুল যে প্রাণ রাজে
ভয় যে জাগে শঙ্কাভরা তেমন বাঁচায়।

এসেছি তো চুকিয়ে দিয়ে ছিল তোমার পাওনা যত,
তবু এমন ডাকছো কেন অবিরত ?
পথ যে গেছে কোন্ সুদূরে তোমার অমন করুণ সুরে
পথের মাঝে ঘনায় ঘরের স্বপন যত।

পিছন বলে মুখের পানে মেলি দুটি করুণ আঁখি,
"ফিরাবো সেই আশায় কিগো অমন ডাকি ?
কোথায় বলো ফিরাবো আর কোথায় সেথা ঠাঁই ফিরাবার
সে যে স্মৃতির সোনার স্বপন মধুর ফাঁকি।

"যখন আমি সত্য ছিলাম ছিলাম বেঁচে ভবের কাজে,
লোকের চোখে ছিলাম জেগে সমুখ-সাজে ;
মোর সে বাঁশীর আশার তানে টানতো হৃদয় সুদূর টানে
উদ্বেলিত প্রাণের চিরলীলার মাঝে।

"চাই নে আমি চাইনে ভুলেও তোমাদের ভাই ফিরিয়ে নিতে,
চাই গো চিরমিলের সুরটি ধরিয়ে দিতে ;
করিয়ে দেওয়া শুধু স্মরণ— আজকে যারে করলে বরণ
তার বাঁশীটিই বেজেছিল সব অতীতে।

"চুকিয়ে তো ভাই দাওনি সবই, দিয়েছ যে অনেক ফাঁকি,
মনে করে' দিতে চাই যা রইল বাকী ;
সমুখ যাহা আসছে পরে দিয়ো গো তার আঁচল ভরে'
মোরে যাহা দাওনি তাহা স্মরণ রাখি!

"মুকুল ছুটে যে পথ দিয়ে সমুখ পানে ফলের মাঝে,
আমার এ সুর ধরিয়ে দিতে চায় গো তা যে।
পিছন সনে সমুখের ভাই সত্য বিরোধ কোথাও যে নাই,
একই বাঁশীর সুরটি সবার বক্ষে বাজে।"

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

অবশেষ

এসো এসো সবাই এসো আছো তোমরা যে যেখানে,
সামনে যারা যারা পিছে ছড়িয়ে যারা বাঁয়ে ডানে।
এসো সুদূর এসো নিকট এসো জানা আর অজানা,
এসো সবাই এসো সবাই কারো হেথা নাইকো মানা।
এসো দরশ গন্ধ পরশ এসো গো ভয় আশা লজ্জা,
এসো স্মৃতি হে কল্পনা এসো সাজ আর এসো সজ্জা ;
এসো লালস এসো বিলাস এসো আলস এসো শ্রান্তি
এসো নিদ্রা এসো স্বপন এসো বিরোধ এসো শান্তি ;

এসো গো লোভ এসো মোহ এসো হিংসা এসো গরব,
এসো কেহ উচ্চকণ্ঠে এসো কেহ গভীর নীরব।
এসো বিভব এস গো যশ এসো শক্তি এসো গো মান,
এসো বিদ্যা এসো গো জ্ঞান এসো চিত্র এসো গো গান;
এসো স্বদেশ এসো বিদেশ এসো বাহির এসো গো ঘর;
এসো মিত্র এসো শত্রু এসো আপন এসো গো পর;
এসো গো কাল এসো বয়স এসো ব্যাধি এসো মরণ;
এসো সবাই এসো সবাই সবাকারেই করবো বরণ।
আমার দেহে মনে প্রাণে যাহার যে ধন মনে ধরে
আশ মিটিয়ে লও গো সকল লও গো লোলুপ দু হাত ভরে',
লওগো কেড়ে লও গো ছিঁড়ে লও গো হরি' লও ভুলিয়ে
লওগো ভেঙে সকল দুয়ার—সকল চাবি লও খুলিয়ে।
কারেও আমি দিব না গো তিলেক তরে একটু ফাঁকি,
কোনো আড়াল রাখবো নাকো রাখবো নাকো কিছুই ঢাকি
তোমরা যাহা নিতে পারো কোথাও বাকী রেখো না লেশ,
অকপটে জানিয়ে দিও লওয়া যখন হবে গো শেষ।
ওগো আমার চিরকাঙাল তুমি এসো সবার পিছু,
তিলেক ফাঁকি দিয়ে কারেও তোমায় দিব না তো কিছু।
যা রয় বাকী সকল লওয়া সকল চুরি কাড়ার শেষে
সবার ফেলে-যাওয়া সে ধন তুমি এসে লওগো হেসে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

বন্ধনের স্বাধীনতা

যখন বেড়া দিয়েছিলাম জীবনের এই বাগানে মোর,
শুধু তাহার নিষেধটুকুই জেগেছিল রূঢ় কঠোর।
তবু সেটুক্ নইলে যে নয় কত দিকে কতই না ভয়,
কত পশুর আনাগোনা জগৎ জুড়ে কত না চোর।

যে রস-ধারা নিত্য বহে নিখিলের এই মর্ম্ম মাঝে,
শুষ্ক বেড়ার নীরস মূলে কেমন ক'রে লাগলো তা যে;
অফুরন্ত প্রাণের লীলায় কঠোর সে যে কোথা মিলায়,
নিষেধ আজি মুঞ্জরিল মন-ভুলানো মধুর সাজে।

সবুজ শোভায় ডুবলো সে যে উঠলো ভরে' ফুলে ফুলে,
ফাগুন হাওয়ার প্রাণের হিল্লোল বুকে যে তার উঠলো দুলে';
শ্যামল প্রচুর জীবন-ধারায় বেড়াটুকুন কোথায় হারায়,
রূপের পাড় কে বুনিয়ে দিল মোর জীবনের কূলে কূলে।

ফুলন্ত ওই বেড়ার রেখায় আঁকলো এমন চিত্রখানি,
রেখার সীমার বাঁধোন মাঝে রূপের অসীম আনলো টানি।
বাঁধোন-রূপে জেগে উঠি মনকে দিল অবাধ ছুটি
মোর বাগানের বেড়াখানি, সে যে পরম ভাগ্য মানি!

অ-বলার বেদন

ওগো তুমি দাঁড়াও গো খানিক।
বাঁধবো নাকো কোনো ডোরে রাখবো নাকো ক্ষণেক ধোরে,
পরাণ ভরে' বলবো বারেক "তুমি মণি তুমি মাণিক"।

ওই কথাটি বলব বলে' গো
দিনের পরে কত না দিন কাটালেম যে শান্তিবিহীন,
কত মরু গিরির পারে এলেম চলে' গো।

ওই কথাটি হয়নি বলা তাই
যে কথাটাই যারে বলি মনে হয় যে কেবল ছলি,
হাওয়ায় ভেসে যায় গো চলি সকল কথাই হায়।

গেছে কেটে কত যে যুগ হায়!
অ-বলা ঐ কথার বেদন চির মূকের নীরব রোদন
জমে' উঠে' বুক যে আমার যায় গো ফেটে যায়।

তোমার কাছে চাইনে কিছুই ধন;
আমার কথার সুরটি লেগে যে হাসিটুক্ উঠবে জেগে
তোমার নয়ন-অধর-কোণে ভরবে তাহে মন।

২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

ইন্দ্র ও শঙ্কর

সুখে থাকুন স্বর্গে ইন্দ্র থাকুন শচী তাঁহার বামে,
আশ মিটিয়ে ভুঞ্জুন তাঁরা চলে যাহা সুখের নামে।
বৈজয়ন্তের বিপুল বিভব জানি তাহার নাইকো সীমা,
জানি আমি ইন্দ্র-রাজা শচী-রাণীর কি মহিমা!
তবুও আমার মনের মাঝে তার তরে নাই একটুও লোভ,
আপনার এই দৈন্য লাগি নাইকো মনে কোনই যে ক্ষোভ।
শচীর সনে দৈবে হ'লে তোমার স্থানের বিনিময়,
তোমারই হার হয় যে খাঁটি বলতে পারি অসংশয়।
রাজরাজেশ্বরীর গর্ব্বে হোন্ না যতই গরবিনী
বিপুল রাজ-আড়ম্বরের উপকরণ মাত্র তিনি।
ঐরাবত আর উচ্চৈশ্রবার উচ্চে বটে তাঁহার যে ঠাঁই,
তবু ভেবে দেখতে গেলে এমনই কি তফাৎটা ভাই?
যেদিন দৈত্য কাড়বে স্বর্গ মিলাবে যে স্বপনখানি
কোথায় ইন্দ্র ত্রিদিবপতি কোথা শচী স্বর্গরাণী!
যেথায় তব রাজ্য, সে যে কোনো অসুর কাড়তে নারে,
সকল কাড়াকাড়ির সীমা ছাড়িয়ে রহে অপর পারে।
আমার মন কেড়েছে কেড়েছে গো শঙ্করের যেই রিক্ততা,
পূর্ণতারি প্রাণের রসে পরম অভিষিক্ত তা!
সর্ব্বহারা শর্ব্ব যিনি কোনো কিছুর নাইকো ভয়,
পরম প্রেমের বৈরাগী যে তিনিই শুধু মৃত্যুঞ্জয়।

অলোক-শুভ্র বৈরাগ্য তাঁর আলোক-সিন্ধু অচঞ্চল,
পরম আলোর একটি পদ্ম রাজেন গৌরী সিতোৎপল।
রিক্ত যে তাঁর সকলখানি কোথাও কিছু নাই যে বাধা,
তাইতো উমা আছেন হেন মিলে তাঁহার সঙ্গে আধা।
মরণের ঠিক বুকের মাঝে শ্মশানের ঘোর কোলাহলে
দোহাঁর চির প্রেমের লীলা তাই তো নিতি এমন চলে।
কোথায় দৈন্য কোথায় দুঃখ কোথায় মৃত্যু কোথায় ডর,
প্রলয়ে আর না রয় কিছু রবেন তবু গৌরী হর।

২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯১৬।

অসাধনের বাঁধন

সোনার বাঁধন দিয়ে তোমায় বাঁধবো কি রে ?
চারু কারু ভূষণ সম পরবো তোরে অঙ্গে মম
মূঢ় জনের মন ভোলাবার গরব-করার রতন হীরে ?

মণি যদি হওগো পরম পরশমণি।
বাইরে সে তো ধাঁধায় না চোখ, মূল্য কি তার জানেই না লোক,
ভূষণ নহে, পরশে তার সকল জীবন মণির খনি।

নও তো তুমি শিল্পে গড়া সোনার কমল,
মণি রতন খচিত্ করি সোনাব কৌটায় রাখবো ধরি,
বিভব দেখে শোভায় ভুলে লোকে আহা ! বলবে কেবল।

ফুটলে যখন জীবন-সরে পদ্মরূপে.
দোঁহার পরম মিলনলীলা কি যে জীবন সঞ্চারিলা,
সকল পরাণ উঠল জেগে মৃণাল সম চুপেচুপে।

বাঁধনু তোমায় অসাধনের সেই বাঁধনে ;
আমার বাঁধন নয় সে কেবল দোঁহার বাঁধন সহজ শ্যামল
জীবন-সফল-করা প্রাণে বাঁধবো কিগো তুচ্ছ ধনে ?

২৯শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৬।

প্রতিক্ষণের পূর্ণতা

হাজার বছর বাঁচিই যদি আমরা দেবতার বরে,
জাগবে না কি সমান প্রশ্ন "তার পরে" ?
বলবো কি গো অকপটে সময় এবার হোলো বটে,
লাগাও চির চাবি তবে মোদের হেথাকার ঘরে ?

সমান তৃষা রইবে জেগে শেষের দিনের শেষ ক্ষণে,
আঁকড়ে ধরে' রইব সেটুক্ প্রাণপণে।
এই ধরণীর পানে চেয়ে বাষ্পে নয়ন যাবে ছেয়ে
"এরি মধ্যেই" ক্ষোভে খেদেই বলতে হবে আনমনে।

কবে আমি বিদায় নিব ব্যাকুল তুমি তার তরে,
প্রেম যে তব উঠছে কেঁপে সেই ডরে।
হাজার বছর বাঁচি তবু এ কাঁপন কি থামবে কভু ?
সমান ব'বে দীর্ঘনিশাস সমান অশ্রুধার ঝরে।

বছর পরে নজর যদি এই যে ব্যথা ঘুচবে না,
আকুল আঁখিজল যে কভু মুছবে না।
সময় দিয়ে প্রাণের শূন্য কখনো কি হয়গো পূর্ণ,
হৃদয় যদি না ভরে, সে অজানারে পূজবে না।

ভালবাসায় ভরি যদি প্রত্যহ আর প্রতি নিমেষ,
পূর্ণ হয়েই আপন মাঝে হয় যদি শেষ ;
নিটোল উজল মাণিকগুলি মালার মতো গাঁথবো তুলি,
যেখানেই সে গাঁথোন থামুক মনে হবে হলো যে বেশ।

১লা মার্চ ১৯২৬।

ভুল

তোমায় যদি ভুলি, সে তো আজকে নয় !
আজ বিরহের আকাশখানি তোমার নয়ন সম মানি,
ছলছল আঁখি তোমার বাষ্পময়।

ওই নয়নের দৃষ্টি মোরে রয় যে ঘিরে !
সকল চিন্তা কাজের পরে শ্যামল সজল ছায়া পড়ে,
শাঙন মেঘে ঢাকল আমার স্বপনটিরে।

করুণা ওর জাগায় যে মোর বেদন নিতি ;
ব্যথা কভু কেউ কি ভুলে ? মোর বিরহের কূলে কূলে
ঢেউএর মত ভেঙে পড়ে তোমার স্মৃতি !

আজকে নহে, ভুলিই যদি ভুলবো গো,
এই বিরহ ঘুচবে যবে, দোঁহে নিবিড় মিলন হবে
তোমার দোদুল বুকের তালেই দুলবো গো।

সেদিন একা কিম্বা দোঁহা মানবে কে ?
নিবিড় সুখের অতল তলে তলিয়ে যাবো পলে পলে,
ভুল যদি হয় সে কথা আর জানবে কে ?

১লা মার্চ ১৯১৬

সত্য ও মায়া

জীবন যদি হয়গো সত্য মোর
সত্য সে যে প্রিয়ার কোমল কোর।
এলো যে সে চুপেচুপে তোমার ভালোবাসার রূপে,
বাঁধলো মোরে মৃণাল-বাহুর ডোর।

জীবন যদি হয়গো কেবল ভুল,
সে ভুল ফুটে উঠল মধুর ফুল।
ওগো আমার পরাণ-বধূ ভুলের ফুলের তুমিই মধু,
ভুল বা সত্য তোমার নাহি তুল।

১লা মার্চ্চ ১৯১৬।

হোরিখেলা

অমন আড়াল থেকে হোরিখেলা হয় কি বঁধু?
এস গো মোর আঁখির আগে দেখবে খেলা কেমন জাগে,
সমান খেলা খেলবে যবে সমান মেতে বর ও বধূ।

ভেবেছিলে ছুটবে শুধু গোপন তব ও পিচকারী!
আমার দেহের অঙ্গে অঙ্গে রংএর ধারা বইবে রঙ্গে,
লুকিয়ে কলহাসি হেসে বহিয়ে দিবে নয়নবারি।

এখন কি টের পেলে বঁধু বধূও তব রঙ্গ জানে?
যতই তুমি আড়াল থাকো একবারে ফাঁক যাবে নাকো
তোমার ও-রং ফিরিয়ে কিছু দিবই তব অঙ্গ পানে।

ভিজেছে মোর বসনখানি, রঙে রঙিন সকল দেহ।
ধরবো আমি সকৌতুকে নিবিড় আলিঙ্গনে বুকে
যত কিছু আছে তোমার যেথায় তব রয় যে কেহ।

রঙিন হবে আকাশবায়ু রঙিন রবি-শশীর আলো,
রঙিন নর-নারীর দেহ রঙিন আশা রঙিন স্নেহ,
তোমার অকূল সাগরবুকে রঙের ঢেউ সে খেলবে ভালো।

এমনি করে রাঙিয়ে যদি দিতে পারি তোমার সবে,
তোমার গায়ে লাগবে যে সে বাহির হয়ে আসবে হেসে,
আমার রঙিন দেহ তোমার রঙিন বুকে লবেই লবে।

২রা মার্চ্চ ১৯১৬।

মরণভয়

জানতে যদি পারিই আমি বুঝতে পারি অসংশয়,
জীবনের এই মেয়াদ আমার এক নিমেষের অধিক নয়;
হঠাৎ কিগো ভাঙবো খেলা এমন জমে ওঠার বেলা?
ভয়ের কালি লেপে দিয়ে সকল আলোই করবো লয়?

বিদায় যখন নিতেই হবে নিবো গো তা হাসিমুখে,
শেষ নিমেষে সকল মধু ভরে আমি তুলবো বুকে!
শেষ নিমেষের পল অনুপল তারেও আমি করবো সফল,
কারেও ফাঁকি দিইনি আমি সেই আনন্দে ঝরব সুখে।

শেষ বসন্তে শেষের ফুলটি যেমন সহজ শোভন ঝরে—
ঝরে তবু বিলায় হাসি ছড়ায় গন্ধ হর্ষ-ভরে।
যে ছন্দে সে উঠলো ফুটে   দেয়না তাহা তিলেক টুটে'
ফোটার প্রথম চরণ যেন ঝরা দিয়েই পূরণ করে।

সুরের সকল শেষের ঢেউটি ঘুমিয়ে পড়ে যেমন ধীরে
অকূল বিপুল স্তব্ধ মহানীরবতার সাগরনীরে ;
ওঠার সুরে পড়ার সুরে   অখণ্ডগান ওঠে পূরে'
তেমনি মিলে বাঁধবোনাকি জীবন সনে মরণটিরে।

৫ই মার্চ্চ ১৯১৬।

দেশকালাতীত

কিসের জোয়ার লাগলো প্রাণে এসে ?
দেশের কালের সকল চিহ্ন যায় বুঝি যায় ভেসে।
হিসাব করে' দেখি যবে   বয়স সে আর কতই হবে ?
মনে লাগে সীমানা তার কোন্ সুদূরে মেশে।

কত কূলের ফুলের গন্ধ কত পাখীর গান !
কত শ্যামল বনের ছায়া কত সোনার ধান,
পেরিয়ে এল জীবনধারা,   আজকে প্রাণে জাগে তারা,
কোন্ সে জন্মান্তরের অস্ফুট ছায়ার ছবিখান।

একটা দীর্ঘ জনম কবে কাটিয়ে এনু আমি
তুমি ছিলে পত্নী যখন আমি তোমার স্বামী।
সে জীবনের সুখ ও ব্যথা যেন ইতিহাসের কথা;
তাদের হৃদয়স্পন্দ গেছে কোন্ অতীতে থামি।

আমাদের সেই গত জনম মোদের মাঝে নাই,
ছায়ার মতন জাগছে মধুর অতীত স্মৃতিটাই।
পতি-পত্নী-ভাবের কথা বাইরে শুনি যথাতথা
গভীর প্রাণে সজীব সাড়া আরতো নাহি পাই।

পতি নহে পত্নী নহে, কেবল তুমি আমি,
তোমার আমার বিপুল বেদন জাগছে দিবসযামী।
দুই চেতনা দোঁহে মিশে ছুটছে দিশাহারা দিশে,
থামে যদি কেউকি জানে কোথায় যাবে থামি।

৬ই মার্চ্চ ১৯১৬।

গোপন নাম

আমার এ প্রেম কেবল তোমার নামটি ধরে' ডাকা—
যে নাম তব কেউ না জানে শোনেনি আর কেউ যা কানে
গোপন তোমার যে নাম তব সকল দিয়ে ঢাকা।

কতই নামের সাড়ায় তুমি কাঁপলে যে বারবার !
কত জনম জন্মান্তরে কতই সুরে কতই স্বরে
কি পুলকে ভুবন তোমায় ডাকলো অনিবার ।

জড়ের মাঝে জীবের মাঝে নর-নারীর মাঝে
কত নাম যে ছাড়িয়ে এলে আপনারে বাড়িয়ে পেলে,
কতই নূতন নূতন রূপে কতই নব সাজে।

কোন্ স্বপনে কোন্‌বা ধ্যানে কোন্ সে শুভক্ষণে
তোমার পরম চরম যে নাম দৈবে আমি তাই লভিলাম
সে নাম যেন রূপটি ধরে' জাগল আমার মনে।

তোমার নিখিল মাঝে সাড়া জাগছে অবিরত—
তোমার দেহে মনে প্রাণে সাড়া বেজে উঠছে গানে,
সুদূর হ'তে দিচ্ছে সাড়া তোমার অনাগত।

ডেকে ডেকে কিছুতে আর মিটছেনা মোর আশা
যত ডাকি মধুর লাগে তোমার কতই রূপ যে জাগে,
তোমার সাড়া জাগিয়ে তোলে আমার ভালোবাসা।

৭ই মার্চ্চ ১৯১৬।

পথিকবধূ

তুমি যেন এই ধরণী-রাণীর স্নেহের মেয়ে ;
কত আদর কি সোহাগে যতনভরা অনুরাগে
মায়ের সেবা-আঁচলখানি তোমায় ছিল ছেয়ে।

আমার সনে দৈবে হ'ল গোপন দেখা তব ;
চোখে চোখে পড়লো বাঁধা, টুটলো সকল বিঘ্ন বাধা,
পরাণ ভরে' জাগলো তব তিয়াষ নবনব।

বিপুল তব প্রাসাদভরা সুখের আয়োজন ;
এক নিমেষে সবই ফেলে আমার পাশেই ছুটে এলে,
অসীম পথের পান্থজনে করলে যে বরণ।

পুরী জুড়ে পড়লো সাড়া পালায় রাজার মেয়ে ;
দুয়ার ছেড়ে যত দ্বারী পিছে পিছে ছুটল তারি,
দরশ পরশ গন্ধ কত ছুটে খবর পেয়ে।

সকল-ছেড়ে-আসা ওগো সকল-বাড়া ধন,
তোমায় নিবিড় বক্ষে ধরে' আমার প্রেমের পক্ষ-ভরে
কোন্ অজানা দিশাহারায় ছুটছি সারাক্ষণ।

দুরুদুরু কাঁপছে ভয়ে দোঁহার বক্ষ দুটি।
ভয়ের দ্রুত কাঁপন-বেগে বুকে বুকে পরশ লেগে
ভয় সে ওঠে ধীরে ধীরে ভালোবাসায় ফুটি'।

এমনি করে' সবখানি ভয় ফুরিয়ে দিব কবে?
বুকে বুকে লাগার যে সুখ রইবে শুধু জুড়িয়ে এ বুক,
এক অখণ্ড ভালোবাসা চেতন ছেয়ে রবে!

৮ই মার্চ্চ ১৯১৬।

সত্য ছল

যে ছল দিয়ে আমায় প্রিয়ে ভুলাও তুমি,
দুঃখে সুখে সারা-বুকে দুলাও তুমি,
সে ছল তব শুধু কি ছল তোমার হাসি নয়নের জল
মোহন মধুর মিথ্যা প্রচুর বিলাও তুমি?

স্তব্ধ অটল সত্য অচল ওই ও ছলে,
গতির রঙ্গে মধুর ভঙ্গে নৃত্যে চলে।
তোমার গভীর ভালোবাসার বিপুল সিন্ধু অকূল অপার
প্রাণের বেগে উঠছে জেগে উর্ম্মিদলে।

রসের ধারা বিকাশহারা ধরার তলে,
আলোয় জাগে কতই রাগে কতই ছলে ;
লতায় পাতায় কি ছল দোলে সবুজ সে ছল ধরার কোলে,
ফুটছে সে ছল গন্ধবিভল, ফলছে ফলে।

ছলের রূপে চুপেচুপে প্রেম যে তব,
পুরাণো সেই সত্যটিরেই রাখছে নব।
চিরদিনের ভালোবাসাই ফুটছে হাজার রঙিন ভাষায়
হোকনা হাজার অর্থ যা তার টেনেই লব।

১০ই মার্চ্চ ১৯১৬।

চুম্বনের সুর

তুমি তো আসনি প্রাণে ওগো মধুরে,
জাগিয়ে মোহন ধ্বনি পদ-নূপুরে।
রিনি রিণি ঝিনি ঝিনি কানে আমি তা শুনিনি
বাঁধিনি বীণার তার তাহারি সুরে।

ফেলিয়ে সকল ভূষা এলে নিশীথে,
এলে ধীরে চুপেচুপে এলে চকিতে।
একেবারে বুকে নিলে বাহুপাশে জড়াইলে,
চিরতরে জুড়াইলে চিরতৃষিতে।

বলয় মেখলা তব বাজি অধীরে
মুখর ক'রেনি সেই মিলনটিরে।
অধরে অধরে লেগে যেই সুর ওঠে জেগে
তারি ঢেউ লেগেছিল নিশি গভীরে।

জীবন-জুড়ানো সেই চুমারি সুরে
পরাণ-বীণায় গান উঠিল ফুরে ;
নয় নূপুরের ধ্বনি কিঙ্কিণী রণরণি
বেঁধেছি বীণায় তার তোমারি সুরে।
১২ই মার্চ্চ ১৯১৬।

চরম প্রকাশ

সকল কথাই কথায় বলা যায় কি প্রিয়ে ?
সকল ব্যথাই নয়নজলে দেয় জানিয়ে ?
সকল সুখ কি অধরপুটে হাসির আভায় উজল ফুটে ?
সকল প্রেম কি কেবল একটি জীবন নিয়ে ?

কত জনম-জনমের যে কত আশাই ;
জড়িয়ে আছে আমাদের এই ভালোবাসায়।
কত লোকে লোকান্তরে তোমার আগে দিলাম ধোরে
আমার গোপন হৃদয়খানি কত ভাষায়।

সেসব ভাষার কথা যে আজ গেছিই ভুলে' ;
ইসারা তার জাগছে আজো তারায় ফুলে ;
আভাসে আজ সেসব বাণী ফুলের গন্ধ দেয় যে আনি,
উঠছে ফুটে ওই আঁধারের কূলে কূলে।

কথা যখন ফুরায় তখন ছন্দ আনি,
কাঁপবে বুকে অর্থহারা বেদনখানি ;
ছন্দ পড়ে রইলে দূরে পরাণ কেঁদে ওঠে সুরে,
সুর হারালে কেবল তোরে বক্ষে টানি।

১৩ই মার্চ্চ ১৯১৬।

চিরদিনের

টলবে না গো কোনো দুখেই পরাণ আমার টলবে না,
কোনো ব্যথার তাপে হৃদয় গলবে না !
যে পথ দিয়ে হবে যেতে রাখেনি কেউ কুসুম পেতে
ভুল পথে তাই এ প্রাণ আমার চলবে না।

আমাদের যে বইতে হবে অনেক প্রাণের অনেক বোঝা,
সময় যে নাই আপন আপন সুখটি খোঁজা !
সকল বোঝাই বইতে পারি করবো জীবন যোগ্য তারি,
সোজা যে পথ তাহাই ধরি চলবো সোজা।

এ হাটে যা যাচ্ছে চলে, চরম চলা নয় তো গো তাই,
অসীম দেশের কালের হাটে চলতে যে চাই ;
কোথাও যদি রয়গো মেকি চিরদিনই চলবে সে কি ?
কঠোর কালের পরখ ছুড়ে ফেলবে কোথায়।

চিরদিন কি কূলে-কূলেই বাইবো মোদের প্রেমের তরী,
গাঁয়ের বোঝাই ব'য়ে এ-ঘাট ও-ঘাট করি ?
বইতে হবে সাত সাগরে অনেক ঝঞ্ঝা অনেক ঝড়ে,
গড়তে হবে তরণী তাই নিত্য স্মরি।

১৪ই মার্চ্চ ১৯১৬।

তুমিময় বিরহ

এই বিরহও সইবে আমার সইবে।
আজো আমার যে বুক ব্যাপি মিলনের সুখ উঠছে কাঁপি
বিরহের এই ব্যথাও সে বুক বইবে।

আর কিছুরি আর কারো এ নয় বিরহ ;
তোমার এ যে তোমার শুধু ওগো আমার পরাণবধূ
তোমায় ভরা কূলে কূলে অহরহ।

মিলন তো মোর নয় গো শুধু তৃষার বারি,
শীতল জলে ক্ষণেক মেটে, আবার ছাতি যায় গো ফেটে,
হাতের নাগাল চায় যে চির জোগান তারি।

বারেক পানে অমর করে সুধার ধারা ;
ভালোই, যদি অধর-আগে নিত্য তাহার পাত্র জাগে ;
না রয়, তবু পরাণ কভু যায় না মারা ।

বিরহ আর মিলন এ দুই পক্ষ ভরে,
প্রেম সে উঠে উর্দ্ধ পানে মুক্ত করি রুদ্ধ গানে,
গগন এমন দেয় ভরিয়ে স্তরে স্তরে ।

১৫ই মার্চ্চ ১৯১৬ ।

নিরাভরণ

ভুললো কেশের বেশের লীলা খুললো অলঙ্কার ;
এ গান তো তাই নয় বিধবা নয় গো ।
চির-এয়ো এয়োতির লাল আভাসটুকু তার
সকল দেহে সকল প্রাণে সব ভুবনেই রয় গো ।
ওই এয়োতির আভায় রাঙা সকল ভবিষ্যৎ ;
ওরি রাঙ্গা সুতোর ডোরে বাঁধবে যে জগৎ ।

বিধবা নয়, সাজলো যে আজ প্রিয়-মিলন লাগি,
ছাড়ল যে তাই সকল ভূষা তার ;
রিক্ত করি সকল দেহ রইল নিশি জাগি,
পরশ-রস-সুধার ধারে ভরবে অনিবার ।
সে পরশ যে ভূষণ হবে সকল অঙ্গে তার,
হাতের কাঁকন হবে সে যে গলার মণিহার ।

ছেড়েছে যে সকল ভূষা খুলেছে সব সাজে,
ধরেছে যে এই বিধবার বেশ ;
আহা ! বঁধুর অঙ্গে যদি একটু কোথাও বাজে,
মিলনে তার কোথাও বাধে লেশ।
কে জানে গো এই যে সে আজ সকল ভূষা ছাড়ে
আড়াল হ'তে গোপন হেসে বঁধুই সে সব কাড়ে।

১৭ই মার্চ্চ ১৯১৬।

বিশ্ব-পরশ

হায় গো ! আমার পরশটুকু অঙ্গে লেগেই রয় গো,
পড়ে না সে ছড়িয়ে ভুবনময় গো !
যেটুকু এসে গায়ে লাগে কেবল তারি বেদন জাগে,
যা রয় দূরে প্রাণে সে মোর কথাও নাহি কয় গো।

মন যে তবু কেমন করে হায় গো আঁখি ঝরে,
রুদ্ধ বেদন ছটফটিয়ে মরে—
যেথায় তুমি ছড়িয়ে আছো সবার মাঝে জড়িয়ে আছো
বুকের আঁচল-ঘেরে তোমায় ধরবো কেমন করে' !

পথ চেয়ে যে বসে আছি এই জীবনে কবে
তোমার দখিন ফাগুন হাওয়া ব'বে !
আমার পরশটুকু নিয়ে সকলখানে ছড়িয়ে দিয়ে
সকল ভুবন ঘিরবে এ মোর বেদন-অনুভবে।

সব পরশের পরশমণি নিবিড় পরশ তব,
সেদিন আমি অঙ্গ ভরেই লবো ;
সেই পরশের অসীম সুখে সব বুঝি মোর যাবে চুকে
একটি কথাও রইবে না যা কানেকানেই কবো।

১৮ই মার্চ্চ ১৯১৬।

অযাচিত

সে যে চাহে না কিছু ;
তাই প্রাণ ছুটে হেন তাহারি পিছু।
যেখানে যে ধন পাই উপহারে সঁপি পায়,
মনে হয় রহে পড়ি অনেক নীচু।

*

সে যে কহে না কথা,
একটু চাহিলে কিছু ঘুচিত ব্যথা।
হোক না সে যেই ধন করিতাম প্রাণপণ,
তবু দূর হতো কিছু এ কাতরতা।

সে যে পরশমণি,
যাহা সঁপি হাসিমুখে লয় অমনি—
হোক্ তৃণ হোক ফুল হোক মণি মহামূল
সে হাসিতে অপরূপ লাগে তখনি।

ওগো কি তার মনে!
এমনি বাঁধিবে মোরে চির বাঁধনে।
চাহিলে সে মুখ ফুটি তাই দিয়ে হতো ছুটি,
হায় গো সে ছুটি বুঝি নাই জীবনে।

১৮ই মার্চ্চ ১৯১৬।

দেহ-বাসর

তোমার বাসর-শয়নখানি এ মোর দেহ।
তুমি বিনে সে কথা কি জানবে কেহ?
চলছে যেমন তেমনি যাবে কেহই কিছু খোঁজ না পাবে
জানবে না কেউ কি যে মোদের গভীর স্নেহ।

বলবো নাকো তিলেক বঁধু দাঁড়াও হোথা,
খুঁজে দেখি বাসর-শেজের সজ্জা কোথা!
দেখে আসি ফুলের গাছে কি ফুল আজো ফুটে আছে
মাটির তলে মাণিক-দীপটি কোথায় পোঁতা!

গাছের ফুল সে আনলে তুলে' যায় যে ঝোরে,
মলিন হয়ে যায় সে মরে' ক্ষণেক পরে।
আমার দেহের কুসুম-বনে ফুল যে ফুটে সকল ক্ষণে
অমল কমল বিভল ফুটে তনুর সরে।
এই যে কঠিন কোমল সুখ-উষ্ণ শীতল,
এই যে মধুর বিধুর সদা স্পর্শ-বিভল,
এই জীবনের কম্প-লাগা নিত্য মুখর স্পন্দ-জাগা
কত যুগের কত সাধন স্বপ্ন সফল!

এমন বাসর-শয়ন তব কি আর বঁধু,
কোন্ সে ফুলে এমন শোভা এমন মধু?
দোঁহার দেহ দোঁহে চুমে স্তব্ধ রবে অঘোর ঘুমে,
জাগবে প্রাণে সুখের অতি-চেতন শুধু।

১৯শে মার্চ্চ ১৯১৬।

বিশ্বের বোঝা

বন্ধু আমার বোঝা এ যে বিষম ভারি!
সারা প্রাণ যে পড়ল নুয়ে এই বুঝি এই লুটায় ভূঁয়ে,
পথ যে এখন অনেক বাকী, আর যে আমি সইতে নারি।

তোমায় বঁধু এ ভার আমার চাই না দিতে;
বইবো আমি বইবো নিজে বইবো আঁখিজলে ভিজে
বইবো আমি স্বিন্ন দেহে বইবো রুধিরাক্ত চিতে।

তুমি বোঝা বইবে সে প্রাণ সইবে কেন ?
যত যাতন যতই না ক্লেশ তোমায় যে তার দিব না লেশ,
মরণ সে তো সইবে সুখে, কলঙ্ক এই বইবে কেন ?

এই যে আমি, একটু আমি, তারই বিষম ভার,
সেটুক্ দিয়ে ফেললে দূরে তাই তো এ প্রাণ মরছে ঝুরে,
সেই কথাটাই বলতে এলাম বন্ধু গো আমার।

দাও মোরে দাও তোমার যে ভার ভুবনের এই ভার,
হাল্কা হবে আমার বোঝা সবই যে মোর হবে সোজা,
এমন কোরে চিরদিন তো কাঁদব নাকো আর।

তোমার বোঝা বহার পথ যে ছাইছে ফুলে গো,
কত গান আর কত আলো মিলে সবই লাগছে ভালো।
আনন্দে যে বোঝার কথা যাবই ভুলে' গো।

১৯শে মার্চ্চ ১৯১৬।

গানময় জ্ঞান

বিপুল জ্ঞানের আয়োজন—এর সব কি মিথ্যে ?
কেবল স্বর্ণ-ধূলায় ঢাকা সহজ চিত্তে ?
দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ এত আয়াস ভুগে
কোনো কিছুই করেনি লাভ কোনো চির আসল বিত্তে ?

ছেড়েছে সে সকল আরাম শান্তি সুখে,
মুখ ফিরিয়ে চায়নি পাশে প্রিয়ার মুখে।
শ্রান্ত দেহে ক্লান্ত প্রাণে চলেছে সে সমুখ পানে,
এক সে লক্ষ্য বক্ষে ধরি তুচ্ছ করি সকল সুখে।

সকল সঁপি জ্বেলেছে যেই দীপ্ত শিখা,
যুগের যুগের সাধন এই যে রক্তে লিখা,
কিছুই কি এর নয়গো কিছু ঘোরা শুধু মায়ার পিছু,
তৃষার তাপে পান করেছে কণ্ঠ ভরি মরীচিকা?

বলবো কি গো সব জানা মোর দাও ভুলিয়ে?
এমন আলোর পটে তিমির দাও বুলিয়ে।
যে ক্ষীণ প্রদীপ-শিখার আলোয় চলছি আমি মন্দ-ভালোয়
চূর্ণ করি চিরতরে ধূলির মাঝে দাও ফেলিয়ে!

ভুলিয়ো না গো, তোমার পরশ বুলিয়ে দিয়ো,
তোমার বুকের তালে তারে দুলিয়ে দিয়ো;
জ্ঞান সে উঠুক বেজে গানে, তার যে গভীর গোপন প্রাণে
সুপ্ত আছে রসের নিঝর তারি ধারা খুলিয়ে দিয়ো।

২১শে মার্চ ১৯১৬

মুক্তের বন্ধন

চির-বাঁধনহীনের বিষম বাঁধন-ডোরে
বাঁধলো মোরে,
বাঁধলো মোরে দেহে মনে   এই জীবনের নিমেষ-ক্ষণে,
মরণ-স্বপন-স্বাধীনতাও ফেললো হরে'।

কোথাও যদি রইত গো জোর একটুখানি,
অভিমানী
এ মম মন দৃপ্ত স্বরে   বলতো যে তার মুখের পরে
কে অপমান বইবে তব বাঁধোন মানি ?

মুক্ত রেখেই ফেললো সে যে বিষম ঘোরে,
হায় গো মোরে ;
কণায় কণায় সাড়া জাগে   কে ধরা দেয় সবার আগে,
বাঁধোন-সৃজন-নেশায় এ মন উঠলো ভোরে।

কোনো ব্যথাই নাই যে-জনার তাহার বেদন,
অসীম রোদন
কেঁদে বেড়ায় আকাশ ঘিরে   ফিরে বেড়ায় এই সমীরে,
উদাস ব্যথায় মন যে আমার করে কেমন।

কিসের বেদন কার যে রোদন বুঝতে নারি,
মোর কি তারি ?
তৃষ্ণা জাগে কেবল চিতে সবখানি মোর কারেও দিতে,
সান্ত্বনা তায় তিলেক যদি দিতেই পারি।

২২শে মার্চ্চ ১৯১৬।

ঋণ শোধ

কপালে যা আছে সে যে ধরবো বুকে,
মনের তলায় তলিয়ে যা তা আনবো মুখে,
বুকে আমার গোপন যে ধন ভরবো তাহে সকল ভুবন,
দুখের চোখের জলের মালা গাঁথবো সুখে।

ফুরায় যা তা ফুরিয়ে পাবো অফুরাণে,
নিত্য নূতন মাঝেই পাবো সেই পুরাণে ;
মরণ সনে করিয়ে রণ মাথার মণি করবো হরণ,
সেই মণিতে সাজিয়ে দিব অসীম প্রাণে।

হাতের নাগাল যা রয় সবই লাগবে মিছে,
সুদূর যাহা ছুটবো কেবল তারই পিছে,
সামনে আজি জাগছে যাহা নিত্য পিছে পড়বে তাহা,
ঘুরিয়ে চাকা ঘুলিয়ে দিবো উপর নীচে।

তোমার মাঝে হারিয়ে আমায় নিবো চিনে,
আপনা বেচে হাটখানি সব নিবো কিনে।
জাগিয়ে তুলে' অসীম ক্ষুধা বহিয়ে দিবো অশেষ সুধা,
যা কিছু মোর বিলিয়ে দিয়ে শুধবো ঋণে।

২৩শে মার্চ্চ ১৯১৬।

বীণাপাণি

তোমার অমল শুভ্র ওরূপ শারদ-সিত মূর্ত্তিখানি,
হায়গো বাণী বীণাপাণি!
জাগলো না তো আমার ধ্যানে, ফুটলো না যে এ মোর গানে,
বাজলো না যে বুকে আমার বীণার তোমার কোনো তানই।

সত্য তুমি জেগেছিলে কাদের ধ্যানে কাদের চোখে,
কোন্ লোকে গো কোন্ আলোকে!
নীহারিকার প্রাণের বাণী ওই কুমারী মূর্ত্তিখানি
শুভ্র তুষাররুচি, তারা দেখেছিল কোন্ পুলকে!

নিমেষহীন যে নেত্র তাদের, বিধির মানসপুত্র তারা,
চপল মোদের রক্তধারা,
দুলতো না যে তাদের বুকে কাঁপতো না প্রাণ সুখে দুখে,
প্রেমের রঙীন তরল মেঘে ঢাকতো না সেই আঁখিতারা।

হায়! কুমারী স্ফটিকরচা, হায়! কুমারী তুষাররুচি,
শুভ্র শারদ-জ্যোৎস্না শুচি,
মোদের প্রাণ যে তৃষায় দহে কতই স্বপন গোপন রহে,
মুখে জাগাই হাসির লেখা, আড়ালেতে নয়ন মুছি।

কুমারী ওই বুকের তুষার কোনো দিন কি গলবে না?
প্রাণের লীলায় চলবে না?
আহা! অমন ডাগর আঁখি উজল শুধুই রবে তা কি?
মেদুর মেঘের মায়া সেথায় একটি দিনও ছলবে না?

সঞ্চারিতে পারিই যদি সঞ্জীবনী মন্তরে
তুষার-হিম ওই অন্তরে,
চপল তরল নেশা-বিভল মানব-শোণিত-বিন্দু কেবল,
কী কোলাহল উঠবে জেগে তনুর শুভ্র মর্ম্মরে!

ছন্দে সে যে স্পন্দি উঠে মন্দ মৃদু আন্দোলে;
পরাণ নাচে হিন্দোলে!
পাথর-গড়া নিটোল স্তনে যে ঢেউ লাগে ক্ষণে ক্ষণে
তার সে মধুর দোলনে মোর মন ভুলে আর প্রাণ ভোলে।

দীপ্ত তব স্ফটিক চোখে আবেশ-ভরা কোন্ মায়া !
কী করুণা ! কোন্ ছায়া !
অসহ ওই শুভ্র বিভা কোমল হ'য়ে আসবে কিবা !
অমল ধবল রবে না আর গৌরী হবে ওই কায়া।

আমার পরাণ-পদ্ম পরে বিরাজ করে যেই বাণী,
গাবে প্রাণের সব গানই,
সকল যে তার দেবতাখানি নারীর মাঝে আন্‌বে টানি,
জাগবে সে যে কার রূপেতে বেশ জানি তা বেশ জানি।

২৮শে মার্চ্চ ১৯১৬।

তোমার কথা

ভেবেছিলাম কথার ছলে আপনাকে আর ছলবো না,
তোমার কথা বিনে আমি কোনো কথাই বলবো না।
কথা যে এই বলতে পারি বুঝবো কি যে মূল্য তারি
আমার পরম এই অধিকার হেলায় পায়ে ঠেলবো না।

কথা তো মোর ফুলের মতো উঠছে ফুটে দিনরাতি,
ফুটছে শুধু এই আনন্দে প্রাণ কি গো মোর রয় মাতি ?
গন্ধ হ'য়ে তুমি যদি না রও বুকে নিরবধি
সে তো শুধু মন ভুলানো মিছে রূপের ছল পাতি !

কোন্ কথা যে তোমার কথা কোন্ কথা যে নয় গো নয়
ভাবতে গেলে দিশেহারা হয় যে আমার এই হৃদয়!
তফাৎ করে' দেখার ঝোঁকে কথা পড়েই না যে চোখে,
শঙ্কা জাগে চিরতরেই মূক হয়ে বা রইতে হয়!

তোমার কথা খুঁজে' মিছে ঘুরবো না সব ঠাঁই বঁধু,
বলবো আমি বলবো আমার নিজের কথাটাই শুধু।
এই ভুবনের সবার বাণী যেটুক ব্যথায় নিবো টানি
জানি আমি জড়াবে তায় তোমার কথার সব মধু!

আমার কথা নিঝর সম ধায় বেগে যে দিনযামী;
পাষাণ বুকে ছুটল সে যে তোমার বেদনায় নামি।
হোক্না সে গো আমার কথা, প্রাণে যে তার তোমার ব্যথা,
সকল কলধ্বনি যে তার সেই ব্যথাটাই গায় স্বামী।

৩০শে মার্চ্চ ১৯১৫

কুমারীর প্রেম

সারাদিনের দাহ আমার সঞ্চিত সব তাপ,
এই জীবনের মলিন ধূলি গ্লানির অভিশাপ,
স্নিগ্ধ হবে কোন্ গহনে? শুভ্র হবে কোন্ গাহনে?
কোথাও কোনো রবে না আর পাপের তাপের ছাপ।

দীপ্ত চোখে জাগছে আমার স্নিগ্ধ ছবিখান,
ক্লান্ত কানে বাজছে নদীর মধুর কুলুতান ;
জাগছে মনে খুবই কাছে আছে কোথায় লুকিয়ে আছে
অতল ছায়ে শীতল নদী, জুড়িয়ে দিবে প্রাণ।

তৃষ্ণা-কাতর হরিণ সম লুব্ধ এ প্রাণ প্রিয়ে,
কালের ব্যবধানের কথা সকল ভুলে গিয়ে,
ছুটে গিয়ে পড়তে যে চায় তোমার অতীত প্রেমের ধারায়,
জুড়াতে চায় কুমারী ওই প্রাণের সুধা পিয়ে।

মন্দাকিনী-শীকর-শীতল বয় ও বুকে হাওয়া,
দাহবিহীন প্রেমের আলো জ্যোৎস্না দিয়ে ছাওয়া।
শুভ্র ও বুক তুষার-ঢালা জুড়িয়ে যে দেয় সকল জ্বালা,
উশীর-অনুলেপন সে যে চন্দনেতে নাওয়া।

অমন শুভ্র নইলে অমন স্নিগ্ধ করুণ প্রাণ
নিঃশেষে যে মিটবে না মোর পরাণ আনচান,
ঘুচবে দাহ মুছবে গ্লানি নবীন হবে পরাণখানি
তরুণ করুণ প্রাণের ধারায় বারেক যদি স্নান।

কুমারী ওই মূর্ত্তি মাঝে চাই যে তোমা ফিরে ;—
মিছে স্বপন, শুধু প্রাণের বিফল রোদন কি রে ?
গিয়েছে যা ফিরবেনা আর তরুণ পরশ ঘিরবে না আর,
প্রেতের তৃষা রইবে শুধু দগ্ধ এ প্রাণ ঘিরে ?

জানি আমি ব্যর্থ নহে এই বেদনার টান ;
তোমার বুকেই আমার চির প্রাণ-জুড়ানো স্থান।
এক জীবনের মাঝে তব ফুটবে জীবন নব নব,
বারেবারেই ছিঁড়বে পত্র-পুটের ব্যবধান।

অগাধ অকূল তোমার প্রাণের অতল পারাবার
আমার বেদন-মন্থনে যে তুলছে অনিবার।
সুধার পাত্র হাতে নিয়ে লক্ষ্মীরূপে তোমায় প্রিয়ে
কতবার যে উঠতে হবে শেষ কি আছে তার।

৪ঠা এপ্রিল ১৯১৬।

অজানার টান

লোকে যখন সুধায় তোমায় মানিই কিনা !
তোমার কোনো কথাই আমি জানিই কিনা।
বুঝতে নারি বলব কি যে জানিনা যে কিছুই নিজে,
বুকে কেবল লই গো তুলে' এ মোর বীণা।

তুমি মোরে জানাওনি গো মানাওনি যে,
সব জানিয়ে আড়াল তুমি রইলে নিজে ;
আলোয় সবি ভরিয়ে দিলে, চোখের আগে ধরিয়ে দিলে,
কেমন করে' জানবো তোমার লীলাই কি যে।

না জানিয়ে কাড়বে আমার সকলখানি,
ব্যথার টানে শুধু এ প্রাণ আনবে টানি,
আপনারে তাই এমনি ঢেকে চোখের আড়াল দিলে রেখে,
ছুটবো তোমার পানে, কিছু নাইবা জানি।

যে পথ দিয়ে দোঁহার প্রাণের যাওয়া আসা,
নয় সে জানা, কেবল সে যে ভালোই বাসা ;
মরমের সব গোপন কথা ভালোবাসার গভীর ব্যথা
ফুটাতে চায় বীণার তারের ব্যাকুল ভাষা।

৫ঠা এপ্রিল ১৯১৬।

মিলন বাধা

এখনো কেন বাজাও মধু বাঁশী ?
সকল মন সকল প্রাণ নিছিয়া পায় করেছি দান,
জীবন-তরী অকূলে চলে ভাসি।

সঁপেছি সুখ, সঁপেছি সব দুখ ;
সকল আশা সরম ভয় তোমার মাঝে হয়েছে লয়,
পেলব মোর নিশীথ-স্বপ্নটুক।

না জানি কিবা রয়েছে ওই সুরে,
জাগায় শুধু দেওয়ার তৃষা কি দেবো খুঁজে না পাই দিশা,
দেওয়ার লাগি পরাণ মরে ঝুরে।

আবার কেন কাঁদিয়া ফিরে তান?
মনের তলে তলিয়ে যাই আপন বলে' কিছু যে নাই,
কি দানে আমি রাখিব সখা মান?

নাগালে মোর যা কিছু ধন জানি
সত্য মোর স্বপন মোর তোমার ওই সুরের ডোর
রচিল চির মধুর মালাখানি!

কি মোর মাঝে দেখেছো পুন বঁধু!
প্রাণের কোন্ সুদূর কূলে আঁধার কবে ফুটিবে ফুলে!
আছো কি বসে' চাহিয়া তারি মধু?

কোন্ সে কাঁটা ফুটেনি আজো ফুলে?
কোথায় কোন্ পাষাণ কারা- মাঝারে ধারা হয়েছে হারা,
বসন্ত কোন্ কুঞ্জ আছে ভুলে?

তোমার দিঠি কোন্ সুদূরে ধায়!
কোন্ অসীমের উদাস আশা পূর্ণ গানের অস্ফুট ভাষা
আমার মাঝে দেখেছো তুমি হায়!

ফুলের প্রাণে যে ফুল জাগে ধ্যানে—
ফুলের সেই স্বপনখানি আমার মাঝে বহিয়া আনি
সফল কি গো করিবে মম প্রাণে !

বুঝিগো তব অল্পে নাহি সুখ !
একটু ত্রুটি তিলেক গ্লানি পাপের শুধু পরশখানি
শেলের মত হানে গো তব বুক ।

আমার মাঝে অতীত মোর জাগে ;
কত যে যুগ-যুগের গ্লানি অণুতে মোর মিশেছে জানি,
বড় যে ভয় সরম মনে লাগে ;

মিলন-বাধা করিতে চির দূর
তাই কি পুন বাজাও বাঁশী, সুরের ব্যথা লাগিবে আসি,
অতীত জড় চেতনে হবে পূর !

বাজাও তবে বাজাও তব বাঁশী
হে মোর চিরকালের বঁধু কর গো চিরদিনেরি বধূ
চিরযুগের সকল গ্লানি নাশি ।

দেহ ও দেহাতীত

(১)

স্পন্দিত মর্ম্মরে গড়া ওই তনু প্রিয়ে,
উদ্দাম-যৌবন-ঊর্ম্মি-মুখর মোহন,
কোন্ সে নন্দন-বনে কোন্ সুধা পিয়ে
তরুণ দেবের নব বসন্ত-স্বপন !
ও যে মোর বহু ভাগ্য ! তবু জাগে মনে,
জড় স্বতন্তর উহা চির অচেতন ;
মহা ব্যবধান ও যে মোদের মিলনে।
কেমনে কাটাই ঘোর দেহের বন্ধন !
মিলন-পরশমণি পরশের মোহে
দুই মনে জাগে এক সুখের স্বপন ;
সে যে তুমি, সে যে আমি, সে যে মোরা দোঁহে,
দোঁহার মাঝারে হুঁহু সম্পূর্ণ মগন ;
কে পুরুষ কেবা নারী ক্ষণে হয় ভুল,
প্রাণ কোথা ভাসি যায় ছাড়ি দেহকূল।

(২)

তাই ভাবি কোনো দিন কোনো শুভক্ষণে
দুজনের হয় যদি নিবিড় মিলন,
নাহি অবসাদ নাহি গ্লানি যে মিলনে,
শ্লথ নাহি হয় যাতে বাহুর বন্ধনে।

প্রচণ্ডবিদ্যুৎশক্তি-সুখপরশনে
পলে মিশে দুই দেহ এক হয়ে যায়,
আনন্দের শিখা জ্বলি স্নায়ুর ইন্ধনে
শেষে জ্বলি জ্বলি চলে, ইন্ধন না চায়।
কোরকের পর্ণপুট খসে' পড়ি গিয়া
ফুল যথা স্বরগের পানে তুলে শির,
সে পরম ক্ষণে দেহ পড়িবে ঝরিয়া,
মিলন-চেতনা শুধু জাগি রবে স্থির।
একিরে প্রলাপ মাত্র বাসনা-স্বপনে ?
কিম্বা সত্য এ রহস্য রস-রসায়নে।

সফল প্রেম

এ জীবলোকে মোদের এ প্রেম ব্যর্থ নহে বন্ধ্যা নহে ;
মোদের ছেলে-মেয়ের মাঝে মোদের জীবন-ধারা বহে।
দোঁহার প্রাণের পরশ লেগে যে প্রাণ-শিখা উঠলো জেগে
তারি আলোর লেখায় মোদের অমরতার আশাস বহে।

মোদের যে এই মিলন সে তো টুটবে নাকো কোনো কালে,
আনন্দ তার উঠবে নেচে তাদের বুকের তালে তালে ;
তাদের প্রতি রক্ত-কণে জাগবো মোরা সকল ক্ষণে,
মোদের বাসর-শয়ন পাতা তাদের অথির স্নায়ুর জালে।

তাদের তরুণ চোখে মোরা এই ধরণীর পানে চেয়ে
অবোধ আকুল হরষ-ভরে বারে বারে উঠবো গেয়ে।
যে মধু আজ গোপন আছে পড়বে ধরা তাদের কাছে,
ভিড়বে তরী কতই দেশে কত মরণ-সাগর বেয়ে।

ভাবের লোকে এ প্রেম নাহি ব্যর্থ হবে বন্ধ্যা হবে,
চিরদিনের প্রেমিক প্রাণে চির আশাস-বাণী কবে।
মোদের ভাবের দেহ দুটি অসীম রূপে উঠবে ফুটি
মাধুর্য্য যে শিশুর মতো সেই মিলনে জনম লবে।

ধীরে ধীরে ভাবের ভুবন ফেলবে তারা ফেলবে ছেয়ে,
মানব-প্রাণে স্বপন সম পশবে অলখ ধারা বেয়ে;
কোনো কিছু নাইকো জানি দূরে যাবে সকল গ্লানি,
মধুর হবে মানব-হিয়া সেই মাধুরীর পরশ পেয়ে।

৯ই এপ্রিল ১৯১৬।

আপন মধু

যে মধু রয় গোপন নিজ মরম-তলে,
তারি তৃষায় জ্বলে যে মোর পরাণ জ্বলে।
সমীরে তার গন্ধ লুটে দিশেহারা বেড়াই ছুটে
পাইনে যে পথ ভাসি কেবল নয়নজলে।

সে যে আমার ছড়িয়ে আছে সকলখানে ;
সে যে নিতি জড়িয়ে আমার দেহে প্রাণে ;
এত কাছে হায় গো তবু মিটবে না মোর তিয়াষ কভু,
সন্ধানে তার ঘুরবো মৃগনাভির ঘ্রাণে !

কতদিন যে কাটতো এমন কেইবা জানে ?
আপন সুধার ক্ষুধার দাহ জ্বলতো প্রাণে ?
যেমনি তুমি এলে প্রিয়ে সুধায় ও-বুক ভরে নিয়ে
ধরলে আমার অধর-আগে প্রাণের টানে,

এক নিমেষে হ'ল যে মোর সবই সোজা,
বোঝার যা নয় মরম যে তার গেল বোঝা ;
তোমার বুকের পাত্র ভরি আমার সুধাই দিলে ধরি,
একেবারে ঘুচলো যে মোর সকল খোঁজা।

তোমার সে প্রেম লাগছে আজি এমন মধু,
নয়গো তাহা নয় যে তব প্রেম সে শুধু ;
যে আনন্দের জাগলো নেশা আমার মধু তাহে মেশা,
আমায় চিনি তোমার মাঝেই পরাণবধূ।

১৩ই এপ্রিল ১৯১৬।

দানের পূর্ণতা

মরম যে তোর একেবারেই দিলি খুলে,
সুধায় ভরে' অধর-আগে দিলি তুলে !
ভ্রমর নিল সকল মধু, তুই কি পেলি কুসুম-বধূ,
সব খোয়ালি হায়গো নারী এ কোন্ ভুলে ?

জানিনা হায় কি মধু পায় ভ্রমর পানে ?
আমি যাহা পেলাম সে মোর মনই জানে।
ভ্রমর যতই নিল পিয়া ভরে' ততই উঠলো হিয়া
প্রাণে কিছু রইলো না ফাঁক কোনোখানে।

ভরলো পরাণ, জলে নয়ন উঠল ভরে' ;
কি পেয়েছি জানাবো হায় কেমন করে' !
পান করে' কেউ লভে মধু, কেউবা সে পায় দানে শুধু,
দেখাবার তা নয় বাহিরে আলোয় ধরে'।

কি পেয়েছি ভাবতে গেলে অবাক মানি ;
ভরা এ প্রাণ পায় না খুঁজে একটি বাণী।
নিতে গিয়ে সকল ধনে বাঁধলো নিবিড় যেই বাঁধোনে
অকূলে মোর লেগেছে তার পরশখানি।

১লা বৈশাখ ১৩২৩।

নববর্ষে

একটি দিনের তরে সবি যাওগো ভুলে,
তরুণ পুলকভরে চাহ নয়ন তুলে।
দোঁহে মোরা ছিলাম একা, হঠাৎ পথের মাঝে দেখা,
অজানার সেই আঘাতে প্রাণ উঠুক দুলে।

সারা দেহে উঠুক বেজে কে ও কে গো!
যা কিছু ধন ইহার পায়ে লুটিয়ে দে গো।
বরণ করে' নেনা তারে যে তোর সকল নিতে পারে,
সারা জীবনখানি ফুলে ফুটিয়ে দে গো!

অতিপরিচয়ের গ্লানি যাক্‌না কেটে,
দোঁহার অসীম রূপের আভা পড়ুক ফেটে,
চমক-লাগা পুলক বিপুল তরুণ অলি তরুণ সে ফুল
দেখে দেখে কিছুতে আর আশ না মেটে।

আজকে শুধু বিস্ময়ে প্রাণ থাকুক ছেয়ে!
অসীম ব্যাকুলতা পরম নিধি পেয়ে।
আজ জীবনের কূলে কূলে বিপুল প্রাণের বেদন তুলে'
অকূল সাগর-পারের পাখী উঠুক গেয়ে।

কচি পাতায় পরাণ উঠে মুঞ্জরিয়ে,
ভরে’ যে আজ উঠলো মোদের দোঁহার হিয়ে।
তাই করেছি আজকে মনে জীবন-জাগা আয়োজনে
দোঁহে দোঁহায় করবো আজি বরণ প্রিয়ে।
১লা বৈশাখ ১৩২৩।

বিশ্বচেতন প্রেম

তোমায় আমি বাসবো ভালো বাসবে তুমি মোরে,
এই তো ছিল কথা—
কোথা হ’তে পড়লো এসে হায়গো কেমন ক’রে
সব জগতের ব্যথা!
দুয়ার হতে ফিরলো যে কার ব্যাকুল ভালোবাসা?
কার যে চিরদিনের মতো ঘুচলো সকল আশা?
কে হেনেছে কাহার বুকে মরম-ভেদী বাণী?
করুণ আঁখির মিনতি-ডোর ছিঁড়লো কে যে টানি?
ভাই যে কোথা ভাইএর বুকে হানলো গোপন ছুরি,
চিরদিনের শান্তি যে কার কে করেছে চুরি?
কোন্ ক্ষুধিতের মুখের অন্ন কে নিয়েছে কাড়ি?
অকূল অশ্রুসাগরে কেই দিচ্ছে একা পাড়ি?
সবার মরম-ভেদী রোদন নির্ম্মমতা যত,
মোদের ভালোবাসার বুকে বাজছে অবিরত।

তোমায় নিয়ে চিরদিন যে কাটবে সুখে প্রিয়ে,
মোদের গোপন ঘরে ;
যে ব্যথা নয় তোমার আমার ভাববো না তাই নিয়ে,
থাকবে আগোচরে।

চিরদিনের তরে সে যে ঘুচলো একেবারে,
সে-সব সুখের আশা।
জানতো কে গো দুকূল ভেঙে বইবে খরধারে
এমন ভালোবাসা !

জ্বেলেছিলাম প্রদীপখানি ঘরের আলোর তরে,
বাহিরও হয় আলো,
জগৎ-জোড়া ব্যথার ছবি পড়লো নয়ন পরে,
আঁধার ছিল ভালো।

ফল্গু সম লুপ্ত ছিল বিশ্ব-বেদন-নাড়ী
একটি ধারে প্রাণে,
তোমার ভালোবাসা যে তার সকল বাধা কাড়ি
বহালো একটানে।

কি হবে,আর মিথ্যা ভেবে, ফেলি নয়নধার
আপন সুখের লেগে,
যে চেতনা উঠলো জেগে নিববে না সে আর,
ঢাকবে না আর মেঘে।

সবার ব্যথাই বইতে হবে আপন মরম-তলে,
রইবে না কেউ দূরে ;
পরম অভিষেক যে প্রেমের সবার আঁখিজলে
নিখিল-হৃদয়-পুরে।
২২শে এপ্রিল ১৯১৬।

জীবন্ত ব্যবধান

তোমার আমার মাঝে আজি এই যে জেগে রয়
বিপুল ব্যবধান ;
কতই নদী কত না বন কতই লোকালয়,
ক্ষেতে ক্ষেতে কতই সোনার ধান,

আকাশ রহে ঘিরিয়ে সব, অধীর বায়ু ছুটে,
দিবস-রাতে আঁধার-আলোর খেলা ;
পাখীর গানে মুখর বনে অযুত ফুল যে ফুটে,
এই যে কোটি প্রাণীর মহা মেলা ;

ওপার হ'তে ব্যথা তব, এ পার হ'তে মম
আঘাত করি কাঁপিয়ে তুলে সব ;
না পড়ে আর বস্তু চোখে, ব্যথার লহর সম
সবই প্রাণে হয়গো অনুভব।

মোদের দুটি পরশ যেন দোঁহার দেহ ছাড়ি,
ছুটেই চলে মিলন-অভিসারে
লয় যে সকল বাহিরখানি আপন মাঝে কাড়ি
ব্যথার বেগে কাঁপিয়ে দিয়ে তারে।

যতই দূরে রইনা কেন, মাঝের ব্যবধান
পরশ হ'য়ে প্রাণে উঠে জীয়ে;
বিরহ এই কাঁদায়, তবু দেয় যে ভরি প্রাণ
ব্যথার রূপে পাই যে তোরে প্রিয়ে।

৬ই মে ১৯১৬।

চিরহাসি

অধরে মোর এই হাসিটুকু রবেই লেগে।
ফুলের মৃদু বাসের মতন রইবে জেগে।
ধ্রুবতারার কিরণ-লেখা আঁধার মাঝে যাবেই দেখা,
ঢাকবে না সে কোনো ঝড়ের করাল মেঘে।

সুখের হাসি মিলায় কোথা দুখের দিনে;
নয়নজলে ডুবলে সে আর কেইবা চিনে!
মলয়-বায়ে যে সুর বাজে নীরব সে যে হবে লাজে
ঝঞ্ঝা যবে টুটবে গো তার প্রাণের বীণে।

সুখের হাসি নয়গো এ নয় অধরদলে ;
চিন্তামণির জ্বলছে আভা মরম-তলে।
এ হাসি যে আমার তুমি আছো 'আমার সকল চুমি,
এই হাসিতে প্রেমের চিরপ্রদীপ জ্বলে।

দিনের আলো মিলিয়ে যে যায় আস্‌লে রাতি ;
রবির করে হারায় কোথা তারার পাঁতি।
নাইকো যেথা দিন ও রাতি সেইখানে যে জ্বলছে বাতি,
সব কিছুতে লাগলো যে মোর তারই ভাতি।

১৫ই মে ১৯১৬।

চির প্রতীক্ষা

এই যে এমন চেয়ে থাকি,
তোমার দেহের পানে মেলি বিভল সম বিভোর আঁখি ;
এই যে সুদূর স্বপন-ছাওয়া তৃপ্তিবিহীন নিবিড় চাওয়া
এই যে অসীম ব্যাকুলতা, কেন এসব জানো তা কি ?

কোন্ সে মধু কোন্ অমিয়া তনুর ফুলে ?
চিরদিন যে এমন আমার তিয়াষ জাগে পরাণ ভুলে !
যতই মধুর হোকনা দেহ অবসাদ কি এড়ায় কেহ ?
বুকের মাঝে পরাণ কি গো দিনরজনী এমন দুলে ?

নয়গো দেহ, নয় কোনো সুখ, চাই যে তোরে!
দেখবো তোরে সকল মেলি নিমেষহারা পরাণ ভোরে'।
'চকিতে যে কখন আসি পলক মাঝে যাওগো ভাসি
কিছু তো তার জানিনে হায়! বাঁধবো তোরে কিসের ডোরে!

তাইতো আছি এমন চেয়ে;
রূপ-লহরীর পরে কবে আসবে তোমার তরী বেয়ে।
'চকিত তব আভাসখানি দেখবো পরম ভাগ্য মানি
ধন্য হব দেহের কূলে অকূলের সেই পরশ পেয়ে।

২১শে মে ১৯১৬।

আমার যশ

যেদিন আমি রইবো না আর সবার মাঝে এই ভবে,
সুখের দুখের কথা আমার সেদিন বলো কেই কবে?
রইবে না তো এমন কিছু জাগবে স্মৃতি আমার পিছু,
লোকের আঁখি টানবে না গো আমার খ্যাতি বৈভবে।

কোনো খেদই নাইকো আমার সবই যদি যায় মুছি,
এই জীবনের সব আয়োজন মরণ সনে যায় ঘুচি;
লোকের মুখের খ্যাতিটা কি বুঝতে আমার নাইকো বাকী
অর্থবিহীন শূন্য হাওয়ায় কোনোদিনই নাই রুচি।

হাটের কোলাহলের মাঝে যে সুর বাজে নির্ঘোষে,
রাজপুরীতে যে সুর চির গুণীগণের মন তোষে ;
সেই সুরে মোর বাঁধিনি প্রাণ চাইনি কোনো দান প্রতিদান
অসাধনের সুরটি আমার বাজাই আপন সন্তোষে।

কানে কানে গাওয়ার যে সুর প্রাণে প্রাণে সঞ্চরে,
গোপন ব্যথার মতন যাহা বাজে প্রিয়ার অন্তরে ;
সেই সুরে যে সাধলো বাঁশী— প্রিয়ার অধর-কোণের হাসি
সকল যশের রাশি যে তার, আর কিসে তার মন ভরে ?

২৩শে মে ১৯১৬।

শেষ কথা

কথার ধারা ব'য়ে চলে, কথাটি কই ফুরালো ?
জনম হ'তে জনম মোরে একটি কথাই ঘুরালো।
বলবো কবে খুলেই গলা— কথাটি মোর হোলো বলা,
চিরদিনের সাধ সে আমার চিরতরেই পুরালো।

একটি মাত্র কথা সে যে,—তোমায় ভালোবাসি গো ;
এই কথাটি বলতে আমি জনম জনম আসি গো।
দরশ পরশ শ্রবণ ঘ্রাণে ওই কথাটিই জাগায় প্রাণে,
ওই কথাটি হাজার সুরে বাজায় আমার বাঁশী গো।

কথা সে যে চিরদিনের, ভাব সে নিত্যি নূতন যে ;
কথা কোথায় পিছিয়ে রহে যতই করি যতন রে।
তাইতো কথার উপর কথা প্রকাশের এই ব্যাকুলতা
কথার মালা গেঁথে যাওয়া তাইতো ক্ষেপার মতন এ।

তোমায় আমি প্রতিক্ষণেই পাই যে গো নূতন করি ;
তার আনন্দ নিত্য আমি কথায় সুরে দিই ভরি ;
সে যে অগাধ সে যে অপার, কথা নাগাল পায় না যে তার,
তাইতো নিত্য নূতন সুরে আবেশ-ভরে সন্তরি।

মরমখানি ফুটত যদি একটি মাত্র ফুলে গো,
দিতাম চিরদিনের তরে তোমার পায়ে তুলে গো।
তার সে মধু বর্ণ গন্ধ জানাতো মোর যে আনন্দ,
কথার লাগি এই যে কাঁদোন যেতাম চির ভুলে গো।
২৭শে জানুয়ারি ১৯১৬।

অশেষ

শেষ হ'য়ে যে হয় না তবু শেষ।
গানটি ফুরায়, প্রাণের মধ্যে চলে যে তার রেশ।
বেদন তার মরে ঘুরে আবার নব নব সুরে
নিত্য নূতন গানের মাঝে ধরে নূতন বেশ।

ফুলটি যখন মাটির বুকে ঝরে,
ফুরায় নাকো তার সে লীলা, যায় না সে তো মরে'।
তার সে প্রাণের কাঁপোন বাজে   ভ্রমরের ওই মরম মাঝে,
আনন্দ আর অনুরাগে দেয় যে তারে ভরে'।

চির গোপন রয় না মরম-তলে ;
সে আনন্দ আবার জাগে নবীন ফুলদলে।
ভাবের মিলন ভবের সনে   এমনি ঘটে ক্ষণে ক্ষণে,
জীবন সনে মরণের এই নিত্যলীলা চলে।

৩০শে জানুয়ারি ১৯১৬।

নির্ম্মাল্য

ফুটলো মোদের দোঁহাকার প্রেম—শুভ্র জুঁই এ ;
প্রাণের গানের সে ফুলগুলি   সেই চরণে দিলাম তুলি
সারা পরাণ পড়ে যেথায় আপনি নুয়ে।
ধন্য তারা পুণ্যপরশ চরণ ছুঁয়ে।

এসো তবে তুমিও এসো নম্রশিরে ;
ওই প্রসাদা ফুলের রাশি   পড়ুক তব মাথায় আসি,
পূর্ণ আমি করতে যে চাই পূজাটিরে।
মহাকবির আশিস তোরে থাকুক ঘিরে।

ফুটলো যে ফুল অন্দরেরি ফুল-বাগানে,
বাহিরের এই উদার আলোয় হয়তো চোখে লাগবে ভালোই,
নিখিল প্রেমীজনের সুরটি লাগবে গানে ;
বাজবে কানেকানের কথা নতুন তানে।

১৪ই বৈশাখ ১৩২৪।